উপন্যাস

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

ঔপন্যাসিক-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ময়মনসিংহে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা মারা যান। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ, আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও তা শেষ করতে পারেননি। কেননা এমএ ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ সালে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' এর সাংবাদিক হন এবং সাংবাদিকতার সূত্রেই কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। তখন থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *বুলবুল*, *পরিচয়*, *অরণি*, *পূর্বাশা* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো। ফেনি হাইস্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি করাচি বেতারের বার্তা সম্পাদক হন এবং তারপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন। প্রথমে নয়াদিল্লিতে ও পরে ঢাকা, সিডনি, করাচি জাকার্তা, বন, লন্ডন এবং প্যারিসে তিনি চাকরি করেন। ১৯৬০–১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৬৭–১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ এবং অতিমাত্রায় সলজ্জ ও সঙ্কোচপরায়ণ একজন ব্যক্তি। তিনি খুব কম কথা বলতেন এবং কথা বলার চেয়ে কাজ করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশি। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ব্যাপক অনুশীলন, অধ্যয়নস্পৃহা ও কল্পনাপ্রিয়তা। তাঁর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো যে তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম হলেও তাঁর সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিশেষত তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের যে সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবনের চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীর মতোই উদ্ঘাটন করেছেন। শুধু উপভোগ্য মজাদার গল্প রচনা তাঁর অভীষ্ট কখনোই ছিল না। তিনি মানব জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *লালসালু* প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ-উপন্যাসে তিনি গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের এক ধ্রুপদী জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) ও *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)-তে চেতনা-প্রবাহ রীতি ও অস্তিত্ববাদের ধারণাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ *নয়নচারা* ও *দুই তীর* প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৬ ও ১৯৬৫ সালে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষামূলক চারখানি নাটকও লিখেছেন। সেগুলি হলো *বহিপীর*, *তরঙ্গভঙ্গ*, *সুড়ঙ্গ* এবং *উজানে মৃত্যু*। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর তিনি প্যারিসে পরলোকগমন করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসটি পড়ার পর আপনি–

- উপন্যাসের শব্দগত অর্থ এবং তার সংজ্ঞার্থ বা উপন্যাস কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বিষয় ও আঙ্গিক ভেদে উপন্যাস কত প্রকার হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- *লালসালু* উপন্যাস সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উপন্যাসের শব্দগত অর্থ এবং তার সংজ্ঞার্থ বা উপন্যাস কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে আপনি একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বিষয় ও আঙ্গিক ভেদে উপন্যাস কত প্রকার হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- উপন্যাসের সঙ্গে আখ্যান কাব্য, নাটক ও ছোটগল্পের পার্থক্য কী তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

কবিতা, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদির মতো উপন্যাসও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। এর অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত বা বিশেষ রূপে ন্যাস বা স্থাপন। অর্থাৎ উপন্যাস এমন এক কাহিনি যা বিশেষ কৌশলে উপস্থাপন করা হয়। বাংলা উপন্যাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Novel এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, a fictitious prose narrative or tale presenting picture of real life of the men and women portrayed–অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত সেই রকম এক বর্ণনা বা কাহিনি যার মধ্যে বর্ণিত মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

উপন্যাস শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞা পেয়ে যাই। আমরা বুঝতে পারি যে, মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় তাকেই উপন্যাস বলা যায়। যেহেতু মানব-মানবীর জীবন যাপনের বিষয়টি উপন্যাসে প্রধান, সেহেতু উপন্যাসের কাহিনি যেমন বিশ্লেষণাত্মক হয়, তেমনই তা হয় দীর্ঘ। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.M. Forster মনে করেন, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।

উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যেই আমরা উপন্যাসের উপাদানগুলির সন্ধান পেয়ে যাই। যেমন–

১. উপন্যাসে একটি দীর্ঘ কাহিনি থাকা প্রয়োজন। তবে কাহিনি মাত্রই উপন্যাস হয় না। মানব-মানবীর অর্থাৎ ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, সাধ, ঘৃণা, হিংসা, ভালোবাসা ঐ কাহিনিতে প্রাধান্য লাভ করে। তবে কাহিনি মাত্রই উপন্যাস হয় না, যেমন– দেবতা, ভূতপ্রেত, জন্তু, জানোয়ারের কাহিনি তো নয়ই এমন কি যে কাহিনিতে কেবল রাজার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দাপট কিংবা পুরোহিতের অনুশাসন প্রধান হয়ে ওঠে, ব্যক্তি মানুষের ঘাত-সংঘাতময় জীবনের কিংবা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে না, তেমন কাহিনিকে উপন্যাস বলা যায় না।

২. ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সম্পর্কজাত বাস্তব ঘটনাবলি ও ঘাত সংঘাতই যেহেতু উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করে সেহেতু ব্যক্তির আচরণ এবং ক্রিয়াকাণ্ডই হয়ে যায় উপন্যাসের প্রধান বর্ণনার বিষয়। উপন্যাসের এ ব্যক্তিকেই বলা হয় চরিত্র বা Character.

৩. উপন্যাসের কাহিনিতে Plot বা সুপরিকল্পিত একটি বিষয় থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে তো প্রতিফলিত করেই, উপরন্তু তা কাহিনির আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তব পরিণতি সম্পাদন করে থাকে।

৪. মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভঙ্গির ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভঙ্গির ভাষা অর্থাৎ গদ্যভাষাতেই উপন্যাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

৫. উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানবজীবন সংক্রান্ত কোন সত্যের উদ্‌ঘাটন অথবা উদ্ভাবন ঘটানো হয়ে থাকে। তাই সার্থক উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক মানবজীবন সংক্রান্ত কোন সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এ ভাবেই উপন্যাস শিল্প মানুষের মন ও মননকে প্রসারিত এবং গভীরতা-স্পর্শী করে তোলে।

মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ থেকেই কাহিনির উদ্ভব। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের এ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সে সময় প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবদেবী, পুরোহিত, গোষ্ঠিপতি ও রাজাদের কীর্তিকাণ্ড কাহিনির বিষয় হয়ে ওঠে। লিপির উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু হতে হতে বহু শতাব্দী গত হয়। ততদিনে মানবসমাজে সম্রাট, পুরোহিত ও ভূ-স্বামীদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেবতা ও রাজার কাহিনিই লিপিবদ্ধ হয় ছন্দোবদ্ধ অলঙ্কৃত ভাষায়। প্রাচীনকালে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ভাষা গদ্যে কাহিনি লেখা হয়েছে অনেক পরে। মুখে মুখে রচিত কাহিনি যেমন রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, জাতকের গল্প ইত্যাদি গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় প্রাচীন কালেই। কিন্তু মানুষ এবং মানুষের জীবন ঐসব কাহিনির বিষয় হতে পারে না, পাত্রপাত্রী মানুষ থাকলেও প্রাধান্য থাকে হুর, পরি, জীন, ভূত, প্রেত দেবদেবী ইত্যাদির। কারণ সমাজে ব্যক্তি মানুষের অধিকার স্বীকৃত না থাকায় ব্যক্তিরও কাহিনিতে প্রাধান্য লাভের উপায় ছিল না।

ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হয়। অজ্ঞতা, কুসংস্কার পরিহার করে জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভরতা এবং মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা এ সবই হয়ে ওঠে শিক্ষিত সমাজের জীবনযাপনের অঙ্গ। একই সময়ে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হলে সমাজে বণিক শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং রাজা, সামন্তভূস্বামী এবং পুরোহিতদের সামাজিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এ পরিমণ্ডলে ভাগ্য ও ঈশ্বরনির্ভরতা পরিহার করে মানুষ হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী, অধিকার সচেতন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। সমাজে ব্যক্তিমানুষ হয়ে উঠে সবিশেষ গুরুত্বপর্ণ এবং ব্যক্তির জীবনই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এ ভাবেই সমাজ পরিবর্তন ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের পটভূমিকাতেই উপন্যাস-এর উদ্ভব ও বিকাশ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অধিকাংশই লেখা হয়ে যায় উনিশ শতকের মধ্যে। ফরাসি, ইংরেজি ও রুশ ভাষায় লেখা উপন্যাসসমূহ যেমন ফ্রান্সের স্তাঁধাল ও এমিলি জোলার 'স্কারলেট এ্যান্ড ব্ল্যাক' এবং 'দি জারমিনাল', বৃটেনের হেনরি ফিল্ডিং ও চার্লস ডিকেন্সের 'টম জোন্‌স' এবং 'এ টেল অফ টু সিটিজ', রাশিয়ার লিও তলস্তয় ও ফিয়োদর দস্তয়ভস্কির 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' এবং 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাস শিল্পকে বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এ সব মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

বিষয়, চরিত্র এবং আঙ্গিকের ভিত্তিতে উপন্যাসকে কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

১. সামাজিক উপন্যাস : যে উপন্যাসে সামাজিক বিষয়াদি প্রাধান্য লাভ করে, তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনিই প্রধান হয়ে থাকে এ জাতীয় উপন্যাসে। যেমন– রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'। নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু'ও সামাজিক উপন্যাস।

২। ঐতিহাসিক উপন্যাস : ইতিহাসের কোন পর্বের গুরুত্বপর্ণ ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে লিখিত উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের কল্পিত ঘটনা বা চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ আছে। কিন্তু এসব চরিত্র বা ঘটনার মাধ্যমে প্রচলিত ঐতিহাসিক সত্য থেকে লেখক বিচ্যুত হতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের

'রাজসিংহ', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মপাল' ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচিত। রুশ ভাষায় লিখিত তলস্তয়ের কালজয়ী গ্রন্থ 'ওয়ার এ্যান্ড পিস' একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৩। **মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস :** যে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের ঘাতসংঘাত ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয়। অবশ্য সামাজিক উপন্যাসে যেমন মনস্তাত্ত্বিক ঘাত সংঘাত থাকতে পারে, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও থাকতে পারে সামাজিক ঘাত-সংঘাত। ফরাসি লেখক গুস্তভ ফ্লভেয়ার লিখিত 'মাদাম বোভারি', দস্তয়ভস্কি লিখিত 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ।

৪। **রাজনৈতিক উপন্যাস :** যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কর্মকাণ্ড প্রাধান্য লাভ করে তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে। যেমন– গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাস 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' এবং সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী'।

৫। **আঞ্চলিক উপন্যাস :** কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবন-সম্পর্কিত উপন্যাস হচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাস। যেমন– তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এবং অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

৬। **রহস্যোপন্যাস :** যে উপন্যাসের গল্পে রহস্যময়তা সৃষ্টি করা হয় তেমন উপন্যাসকে রহস্যোপন্যাস বলা হয়। দীনেন্দ্র কুমার রায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ লেখক বাংলা ভাষায় বহু রহস্যোপন্যাস লিখেছেন।

এ ছাড়া বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও উপন্যাসের শ্রেণি বিভাগ করা যায়। যেমন ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল মানুষের বদলে জন্তু জানোয়ারকে পাত্রপাত্রী করে লিখেছেন রূপক উপন্যাস 'এ্যানিমেল ফার্ম'। মানুষের মনোলোকে বর্তমানের অভিজ্ঞতা, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা একসঙ্গে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের ভাষিক বর্ণনা দিয়ে চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস লিখিত হয়। আইরিশ লেখক জেম্‌স জয়েসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউলিসিস' এমনই একখানি উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত 'চাঁদের অমাবস্যা'কেও চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস বলা হয়।

বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা আধুনিক কালে। আমরা জানি গদ্যই হল উপন্যাসের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। সুতরাং গদ্য সৃষ্টি না হলে উপন্যাস রচনার প্রশ্নই ওঠে না। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এ কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে প্রথম বাংলা গদ্য লিখিত হয়। তবে গদ্যসাহিত্য রচনার উপযোগী হয়ে উঠতে বেশ সময় লাগে। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত "আলালের ঘরের দুলাল" নামক কাহিনিগ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বাংলা সাহিত্যে সুন্দর গদ্যে উপভোগ্য যথাযথ কাহিনিসমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' একটি সার্থক রচনা। প্লট বা কাহিনির যথার্থবিন্যাস এবং চরিত্রসৃষ্টিসহ উপন্যাস রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তব্য সমন্বিত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনি তিনিই প্রথম যথার্থ গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই দূর অতীতের কল্পনা বেশি– সমকালীন জীবন প্রায় অনুপস্থিত। কেবল 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ দুটি উপন্যাসে সমকালীন জীবন বাস্তবতা মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিধবা রমনীর প্রণয় এবং বিবাহ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কী রকমের জটিল সমস্যা এবং তীব্র সংকট সৃষ্টি করতে পারে তারই কাহিনি তিনি ঐ দুই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁর বক্তব্যে বিধবা নারীর মানবিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। এরূপ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসের বিকাশের পথটি খুলে দিয়েছেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটাপন্ন ব্যক্তিজীবনের কাহিনিগুলি রচনা করেন 'চোখের বালি' 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাসে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই বাংলা উপন্যাসে প্রকৃত আধুনিক চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটান। উদার মানবতাবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লেখকের দৃষ্টিতে বিধবার প্রণয় পাপকার্য বলে স্বীকৃত হয়নি এবং সেই কারণে প্রণয়িনী বিধবাকে প্রাণ দিয়ে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়নি। সংস্কার ধর্ম ও আদর্শের চাইতে মানুষের জীবন যে অনেক বেশি মূল্যবান– এ বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। 'গোরা', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে আবার ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের অভিপ্রায় ও বাসনার প্রতিক্রিয়া যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনই জগৎ ও বৃহত্তর জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে বাংলা উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু গ্রামীণ সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি এমন অন্তরঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব কম। সামাজিক সংস্কারের পীড়নে নারীর অসহায়তার এমন করুণ চিত্রও আর কোনো লেখক আঁকেননি। বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত মানব মনের জটিল-কুটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারণ করে আছে তাঁর 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে সামাজিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত তা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। একদিকে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক সংকট যেমন মানুষের পারিবারিক জীবনকে জটিল করে তুলছিল, তেমনি অন্যদিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছিল অধিকার সচেতন। এ নতুন সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নবীন লেখকদের আগ্রহী করে তোলে। তাঁদের কাছে সমাজের দরিদ্র এবং অজ্ঞাত মানুষের জীবন সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়– এ তিন লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপন্যাসকার হয়ে ওঠেন, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজদের গড়া নতুন নগরী ও রাজধানী কলকাতা। সেখানে সমাগত হিন্দু মধ্যবিত্তই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় তাদেরই ভূমিকা অনেকদিন পর্যন্ত অগ্রগণ্য ছিল। মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব হয় পরবর্তীকালে। প্রথম পর্যায়ে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবর রহমান প্রমুখ লেখককে পাই। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ লেখককে। এঁরা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বেশি কাজ করলেও উপন্যাস রচনার ধারাবাহিকতায় এঁদের নাম স্মরণীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের উত্তরসুরী শওকত ওসমান, আবু রুশদ্ এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার লেখক। ব্যক্তি, সমাজ, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জীবনকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন। বলা যায়, এঁদের এবং এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষায় উপন্যাসের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছে।

লালসালু

'লালসালু' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। প্রথম উপন্যাস হলেও এটিকে আমরা একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করতে পারি। আধুনিক ও নাগরিক রুচির অধিকারী উচ্চশিক্ষিত এ লেখক তখন কলকাতার অভিজাত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র The Statesman-এর সাংবাদিক। ঐ সময় নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন নানা ঘাত সংঘাতে হয়ে ওঠে অস্থির ও চঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের কারণে মধ্যবিত্তের জীবন টালমাটাল– এমন এক ক্রান্তিকালে একজন নবীন লেখকের পক্ষে তাঁর চারদিকের পরিচিত জীবন ও মানুষ নিয়ে উপন্যাস লেখাই ছিল স্বাভাবিক ও সহজতর। কিন্তু তা না করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এমন একটি পটভূমি বেছে নিলেন তার প্রথম উপন্যাসের জন্য, যার অবস্থান শহর নয়, প্রধানত গ্রাম। সমসাময়িকতা থেকে যেমন, তেমিন পাঠকের প্রত্যক্ষতা থেকে দূরবর্তী।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে থাকে। সেখানেই তাদের বাঁচা-মরা এবং জীবন যাপন। সেই সমাজে এমন সব রীতিনীতি, ধারণা ও বিশ্বাস জন্মলাভ করে, চালু থাকে যা শহরবাসী শিক্ষিত লোকের অভিজ্ঞতার বাইরে। দুঃসাহসী তরুণ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রথম উপন্যাসের পটভূমি, পাত্রপাত্রী ও বিষয়বস্তু সবই গ্রহণ করলেন সেই গ্রামীণ জীবন থেকে। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজচরিত্র একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসী এবং অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক-ভূস্বামী। তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগযুগব্যাপী শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনের দ্বন্দ্ব।

লালসালু উপন্যাসে লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান, যেখানে যুগযুগ ধরে মানুষের মনের চারদিক ঘিরে আছে অসম্ভব শক্তি, অথচ অদৃশ্য এক বেষ্টনী - মানুষ যেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য বলে মেনে নেয়, আর তার অগাধ

বিশ্বাস অলৌকিকত্বে। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই সে পারলৌকিক শক্তির লীলা দেখতে পায়, আর তাতে নিদারুন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে একেবারে ভূমিতে নুয়ে পড়ে। কাহিনি যতই উন্মোচিত হতে থাকে ততই দেখা যায়– "শস্যের চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি।" কেবলই কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস সেই সঙ্গে অনিবার্য পরিণতি ভীতি এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ– গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। লেখক দেখান, এ এমনই এক সমাজ যার পরতে-পরতে কেবলই শোষণ আর শোষণ। দেহের, মনের এবং সামগ্রিক জীবনের। প্রতারণা, শঠতা, আর শাসনের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শেকড় জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়ানো। আর ঐ সব শেকড় দিয়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবনের প্রাণরস প্রতিনিয়তই শুষে নেওয়া হয়। আনন্দ, প্রেম, প্রতিবাদ, সততা– এসব বোধ এবং বুদ্ধি ঐ অদৃশ্য দেওয়ালে ঘেরা সমাজের ভেতরে প্রায়শই ঢাকা পড়ে যায়।

আবার এ সামাজিক অবস্থার ভেতরেও একটি বিপরীত দিক আছে। আর তা হল, মানুষের প্রাণধর্মের দিকটি। মানুষ ভালবাসে, স্নেহ করে, কামনা বাসনা এবং আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে একেবারে ফেটে পড়ে। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনার কারণেই সে নিজেকে আলোকিত ও বিকশিত করতে চায়। সংস্কার যতো শক্ত হোক, অন্ধবিশ্বাস যতো দৃঢ় হোক, ভয় যতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখুক, প্রাণধর্মের সহজ প্রেরণা সমস্ত কিছু ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসবে। যদি সফল নাও হয় তবু দ্বন্দ্বটি কখনও পরিত্যক্ত হয় না। জন্ম থেকে জন্মান্তরে তা চলতে থাকে– এই দ্বন্দ্ব দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে যেমন থাকে, তেমনিভাবে থাকে একই ব্যক্তির মনোলোকেও। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ দ্বন্দ্বময় সামাজিক বাস্তবতার চিত্রই এঁকেছেন তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানবতাবাদী লেখক। মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও স্বাভাবিক বিকাশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে যে সক্রিয় ছিল এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমাদের দেশের সামাজিক বাস্তবতায় যা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় সেগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, দেখিয়েছেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রচণ্ড-দাপটে সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ কীভাবে বিভ্রান্ত হয় এবং শোষণের প্রক্রিয়া চালু থাকে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মবিশ্বাস নয়– ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপী বেশি, ধর্মের চেয়ে ধর্মের আগাছা বেশি'। ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে এসেছে কিন্তু কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই করে দিয়েছে দুর্বল। মানুষের মনকে আলোড়িত তো করেইনি বরং করে তুলেছে অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ভীত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আঘাত সেখানে।

গভীর মনোযোগ এবং অত্যন্ত যত্নের কাজ 'লালসালু'। গতানুগতিক ঘটনা নির্বাচন ও উপভোগ্য কাহিনির জন্য ঘটনা বিন্যাসের পথে অগ্রসর হননি লেখক। নরনারীর প্রেম কিংবা দুই প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনাবহুল কাহিনিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি এ উপন্যাসে। অথচ মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখাতে চান তিনি– মানুষেরই কাহিনি বর্ণনা করার অভিলাষ তাঁর। ফলে চরিত্র ও ঘটনার সেই সব গূঢ় ও রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি দেখতে ও দেখাতে হয়েছে তাঁকে যা জীবনকে চালায় এবং থামায়। মানুষের মনে লোভ, ঈর্ষা, লালসা, বিশ্বাস, ভয়, কামনা-বাসনা আছে বলেই বিচিত্রসব ঘটনা ঘটে। ধর্ম ব্যবসায়ীকে মানুষ ভয় পায়। কেন? কারণ তার বিশ্বাস লোকটির পেছনে রহস্যময় একটি দৈবশক্তি কাজ করছে। আবার ধর্ম ব্যবসায়ী ভণ্ডটির ভয় কিসে? সে জানে, কোনো মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বুদ্ধি বলে তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিটাকে ধ্বসিয়ে দিতে পারে। সমাজে প্রচলিত এই ধর্মান্ধতা, ধর্মবিশ্বাস, ভণ্ডামি, কুসংস্কার এবং নরনারীর মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলিই লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে 'লালসালু'তে।

এমনিতে উপরিকাঠামোর সাধারণ বিচারে আমরা বলতে পারি যে 'লালসালু' একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। নিরক্ষর দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী তার জটিল, কুটিল ছলনাজাল বিস্তার করে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'লালসালু' উপন্যাসে। কাহিনি বড় নয় কিন্তু এর মজবুত বিন্যাসে এমন এক ধরনের বিশ্লেষণমূলক বিস্তার লক্ষ করা যায় যে, তাতেই অতি সাধারণ কাহিনি এবং ঘটনা দুই-ই অসামান্য এবং তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

গদ্যে লেখা মানবজীবনের বাস্তবতাভিত্তিক দীর্ঘ কাহিনিকেই আমরা উপন্যাস বলে থাকি। মানুষের জীবন ও বাস্তবতা অবলম্বনে আরও এক ধরনের গদ্যকাহিনি আছে যার বিস্তার দীর্ঘ নয় এবং যার অবলম্বন মানুষের সমগ্র জীবন নয়। মানব জীবনের এই বিশেষ কোনো দিক অথবা জীবন সম্পর্কিত কোনো সত্য কিংবা কোনো আনন্দ বা বেদনাঘন মুহূর্তকে যখন স্বল্প পরিসর গদ্যকাহিনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন তা হয় ছোটগল্প। সুতরাং উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে

উপাদানগত মিল থাকলেও দুইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় দুটিকেই আলাদা আঙ্গিকের শিল্প বলে বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করেছেন।

আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্যে চরিত্র ও কাহিনি দুই-ই আছে, তা সত্ত্বেও এ দুই শ্রেণির সাহিত্য উপন্যাসের বিকল্প হতে পারে না। কারণ গদ্যে লিখিত উপন্যাসে জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এবং মানব চরিত্রের জটিল ও রহস্যময় আচরণ বিশ্লেষণ ও উত্থাপন করা সম্ভব, যা কাব্যে বা মহাকাব্যে সম্ভব হয়নি।

আবার উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে বিষয়গত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উপাদান ও উপস্থাপনের দিক থেকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। নাটকে একটি কাহিনিকে মঞ্চের ওপর পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত করে হয়। অধিকন্তু যে কাহিনিটি নাট্যকার করেন তাতে বিশ্লেষণ বা বর্ণনার কোনো সুযোগ নেই, সবই প্রকাশ করা হয় পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে। সুতরাং মানবিক কোনো কাহিনি এবং সমাজের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সমন্বয় ঘটলেও নাটক ও উপন্যাসের পার্থক্য দুস্তর, যদিও বহু বিখ্যাত উপন্যাসকে সার্থকভাবে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

কবিতা, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদির মতো উপন্যাসও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় সাধারণভাবেই তাকে উপন্যাস বলা যায়। বিষয়, চরিত্র এবং আঙ্গিকের ভিত্তিতে উপন্যাসকে কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন– সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, রহস্যোপন্যাস। বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা আধুনিক কালে। গদ্যই হল উপন্যাসের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে প্রথম বাংলা গদ্য লিখিত হয়। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক কাহিনিগ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বাংলা সাহিত্যে সুন্দর গদ্যে উপভোগ্য যথাযথ কাহিনিসমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' একটি সার্থক রচনা। প্লট বা কাহিনির যথার্থবিন্যাস এবং চরিত্রসৃষ্টিসহ উপন্যাস রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তব্য সমন্বিত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনি তিনিই প্রথম যথার্থ গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধি ঘটান। সংস্কার ধর্ম ও আদর্শের চাইতে মানুষের জীবন যে অনেক বেশি মূল্যবান– এ বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের অভিপ্রায় ও বাসনার প্রতিক্রিয়া যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনই জগৎ ও বৃহত্তর জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। এরপরে বাংলা উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু গ্রামীণ সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি এমন অন্তরঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব কম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়– এ তিন লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপন্যাসকার হয়ে ওঠেন, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব হয় পরবর্তী কালে। প্রথম পর্যায়ে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবর রহমান প্রমুখ লেখককে পাই। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ লেখককে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের উত্তরসুরী শওকত ওসমান, আবু রুশদ্ এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার লেখক। 'লালসালু' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। প্রথম উপন্যাস হলেও আমরা একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করতে পারি। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজচরিত্র একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসী এবং অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক-ভূস্বামী। তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগযুগব্যাপী শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনের দ্বন্দ্ব। 'লালসালু' একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। নিরক্ষর দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী তার জটিল,

কুটিল ছলনাজাল বিস্তার করে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'লালসালু' উপন্যাসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপন্যাস হচ্ছে–

ক. দীর্ঘ রচনা
খ. সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ
গ. সৃষ্টিশীল রচনা
ঘ. চিন্তামূলক রচনা

২. উপন্যাসের কাহিনি হতে হয়–

i. কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ
ii. সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতপূর্ণ
iii. অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও iii
গ. ii
ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

উপন্যাস আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি। এটা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। উপন্যাস কখনও কাহিনি-নির্ভর, কখনও চরিত্র-নির্ভর, কখনওবা সমাজ সমস্যা-নির্ভর। সমাজ-নির্ভর উপন্যাসে সামাজিক বিষয়, রীতি-নীতি, ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু যে রচনার বৈশিষ্ট্য–

ক. সিরাজউদ্দৌলা
খ. লালসালু
গ. বিড়াল
ঘ. বিলাসী

৪. উদ্দীপকের আলোকে 'লালসালু'-কে যে ধরনের উপন্যাস বলা যায়–

ক. সামাজিক উপন্যাস
ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ. আত্মজৈবনিক উপন্যাস
ঘ. আঞ্চলিক উপন্যাস

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গ্রামবাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মসংলগ্নতা, পশ্চাদপদতা ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ ও প্রথম জমায়েতের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে– প্রদেশেরও; হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌঁছোয় এ-দেশে, তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারু-কাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চীৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে– তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতোমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জান-পছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা– যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না– কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়– এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরাণ মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেস্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্টভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরিভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ– এমনকি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে– যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল– সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠে আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

–আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

–আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। ক্বচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে– মৌলবির গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবির চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়তো।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায়– মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধান ক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রঙ দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান-ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেলো। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন– চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের একপ্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে– চোখে তার তেমনি শিকারির সুচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাই-এর ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে– নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতকে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিলো, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠলো, তীরের মতো বেরিয়ে গেলো একটা কোঁচ। সা–ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হাঁ-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়– সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহ্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা– নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নেই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আলগোছে– আলগাভাবে, পৃথকভাবে। **একাগ্রতা–** সূচের আগার মতো তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন একমুখী দৃষ্টি। **ক্বচিৎ–** কদাচিত, কখনও কখনও। **কোঁচ-জুতি–** বিল থেকে মাছ ধরার জন্য লোহার তৈরি ধারালো ফলার বল্লম জাতীয় হাতিয়ার।

কোটরাগত নিমীলিত চোখ– ভেতরে বোঁজা দুটি চোখ। **খোদার এলেম–** ধর্মীয় বিদ্যা। **চড়া কেটে সে বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে–** অতীতের ধর্মীয় শিক্ষাকে বর্তমানের যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে উপযোগী করে তোলা। **জানপছানের লোক–** আত্মীয়স্বজন, প্রাণ প্রিয় লোক, প্রিয়জন। **জ্বালাময় আশা–** তীব্র জ্বালা ও ক্ষুধা মিশ্রিত আশা। **দিনমানক্ষণের সবুর–** সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা। দেরী করা সহ্য হয় না। তর সয় না। **দীপ্ত–** আলোয় ভরা। **দেহচ্যুত হয়ে–** ট্রেনের বগি থেকে ইঞ্জিন যখন পৃথক হয়ে পড়ে। **দৌলতখানা–** বাড়ি বা ঠিকানা। **ধর্মের আগাছা বেশি–** সত্যিকারের ধর্মভাবের চেয়ে কুসংস্কারের প্রাধান্যই বেশি। **ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসন্ত্র করে রাখে–** ধোঁয়াটে আকাশ অজানা ভবিষ্যৎ, অনিশ্চয়তা ও আঁধারের প্রতীক। যে অঞ্চলের কথা লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন তাদের অভাব অনটনের জীবন এতই অনিশ্চিত যে তা যেন ধোঁয়াটে আকাশকেও হার মানায়। **নলি–** নলের ন্যায় সরু ছোট নৌকা। **নিদ্রাচ্ছন্ন–** ঘুমে বিভোর, ঘুমন্ত। **নিথর–** নিস্তব্ধ, নিশ্চল। **নিরাক পড়া–** হাওয়া বাতাসহীন গুমোট আবহাওয়া। **নিস্পন্দ–** কোনরূপ শব্দহীন সূচাগ্র। **নিস্পলক–** চোখের পাতা না ফেলা। **পানি নয় তুলো–** বিলে নৌকা এত সাবধানে ও নিঃশব্দে চলে যেন মনে হয় পানির ওপর দিয়ে নয় তুলোর ওপর দিয়েই চলছে নৌকা। **ফাঁসির সামিল–** ফাঁসির শাস্তির ন্যায় কষ্টকর। **ফিকে দাড়ি–** পাতলা দাড়ি। **বহির্মুখী উন্মত্ততা–** বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠা। **বাহে মুলুকে–** উত্তরবঙ্গে। **বিরাণ–** ফাঁকা, খালি। **বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা–** কাজের খোঁজে বা চাকরির সন্ধানে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য আগ্রহ। **বৈরিভাবাপন্ন–** শত্রুভাবাপন্ন। **মুখথোবড়ানো**– পর্যুদস্ত, ক্লান্ত। **শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের**– বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন- এখানে খাদ্যশস্যের প্রকট অভাব অথচ জনসংখ্যার ভারে মানুষ গিজ গিজ করছে। **শস্যের চেয়ে টুপি বেশি–** খাদ্যশস্যের অভাব হলেও মাথায় টুপি পরা মুসলমানের সংখ্যা বেশি। **শীর্ণ দেহ–** চিকন দুর্বল শরীর। **সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে–** আচমকা জেগে ওঠে। **সরভাঙা পাড়–** নদীর প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া পাড়। **সরুগলা কেরাত–** চিকন মিহি সুরে কোরানের সুরা পড়া। **সন্তর্পণে–** সাবধানে। **সর্পিল গতিতে–** সাপের চলার মতো আঁকাবাঁকা গতিতে, আস্তে আস্তে। **হা শূন্য**– অভাবগ্রস্ত।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, অভাব ও ক্ষুধাক্লিষ্ট নোয়াখালি জেলার গ্রামাঞ্চল। এ অঞ্চল যেমন জনবহুল তেমনি নদীবহুল। তবে খেতে শস্য নেই, কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। তাই লোকজন দেশের নানা অঞ্চলে সামান্য কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। যত দুর্গম অঞ্চল হোক সেখানে ছুটে যায়, কাজের আশায়। নিবিড় রাতে রেলগাড়ির খুপরিতে ঢুকে অজানা পথে তারা পাড়ি জমায়। পথের সম্বল তাদের পুটলি-বদনা, কারও কারও পুঁথিগত কিছু ধর্মবিদ্যা। কেউ আমসিপারা পড়া, কেউ কোরানে হাফেজ, কেউ বা আলীয়া মাদরাসা ডিঙানো। যদিও এসব গ্রন্থের অর্থ কোনোদিন তারা বোঝেনি। শহরে-বন্দরে-গ্রামে, নদীতে-সমুদ্রে যেখানেই হোক, কাজ চাই। হোক না এ কাজ জাহাজের খালাসি, কারখানার শ্রমিক, ছাপাখানার মেশিনম্যান, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন। শহর-বন্দরে হাজারো মসজিদ, তারপরও কর্মসংস্থান হয় না। যমুনা পার হয়ে কেউ চলে যায় উত্তরবঙ্গে, কেউ বা গারো পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে। এমনি জঙ্গলময় নিভৃত গারো অঞ্চলে এক বাঁশের তৈরি মসজিদ আঁকড়ে পড়ে আছে একজন, সেও সুদুর নোয়াখালি থেকে আসা এ-মসজিদের ইমাম। নাম তার মজিদ। মজিদ বলে, খোদা তালার আলো ছড়াতে সে এসেছে এখানে। গ্রামের ছেলে তাহের ও কাদের ডিঙিতে করে মাছ ধরতে বেরিয়েছে বিলে। ধানক্ষেত দিয়ে সাবধানে নৌকা চালাতে চালাতে তারা দেখে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর একটি লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটি বোঁজা, মুখে কগাছি দাড়ি। কিছুক্ষণ পর লোকটি উত্তর দিকে হেঁটে মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে। এখানেই তাহের-কাদেরের বাড়ি। লোকটিকে তারা বিকেলে গ্রামের জোতদার খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে নানা বয়সী লোকের সমাগমে দেখতে পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'লালসালু' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশকাল হচ্ছে–

ক. ১৯৪৮ খ. ১৯৫২
গ. ১৯৬১ ঘ. ১৯৬৭

৬. কাদের আর তাহের কীভাবে লোকটিকে চেয়ে দেখে?

ক. নির্ভীক দৃষ্টিতে
খ. নিষ্পলক দৃষ্টিতে
গ. অবাক দৃষ্টিতে
ঘ. তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আকালের এলাকার মানুষ সুমন। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সে গিয়েছে দূরের গ্রাম ঊনশিয়ায়। সেখানে সে একটি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাকে তীর্থস্থান বলে শনাক্ত করে। গোটা কয়েক চেলা জোগাড় করে সেখানে সুমন শুরু করে তার কথিত তীর্থসেবা।

৭. উদ্দীপকের চরিত্রটির সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আক্কাস মিঞা
খ. খালেক ব্যাপারি
গ. মজিদ
ঘ. কাদের

৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে–

i. পীর সাজার চেষ্টায়
ii. ভাগ্য পরিবর্তনে
iii. ধর্ম ব্যবসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মজিদের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- গ্রামের লোকদের সঙ্গে ফসলি জমির সম্পর্ককে মজিদ কোন দৃষ্টিতে দেখে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রহীমা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এ জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চীৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলী ছিলো। জোয়ান মদ্দ কালু মতি, তারাও ছিলো। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

–আপনারা জাহেল, বেএলেম, আন্‌পাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিলো সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিলো। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

–আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ। –মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিলো। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভূঁই-এ সে বসবাস করছিলো। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিলো; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিলো তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতোমধ্যে বার কয়েক শুনেছে সে-কথা,তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

–উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি-ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে কথা স্পষ্ট বুঝেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিলো যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে

সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিলো, ভয়ও ছিলো। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেলো। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নোতুন দেহ ধারণ করলো। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগলো, মোমবাতি জ্বলতে লাগলো রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিলো, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠলো; হাওয়ার ভাঁপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠলো।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগলো। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা– ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠলো। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালি হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিলো।
দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিলো।
শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা। সত্যি সে লম্বা চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।
তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ– যে-দেহ দূর থেকে আলি ঝালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিলো– তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।
ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,
–অমন করি হাঁটতে নাই।
থমকে গিয়ে রহীমা তার দিকে তাকায়।
মজিদ বলে,
–অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এ মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা– থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুণাহ্।
এ-কথা আগেও শুনেছে রহীমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথায় বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।
মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহীমার চোখে ভয়। মধুরভাবে হেসে আবার বলে,
–অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইব।
শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াৎ শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহীমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহীমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,

–খোলা জাগায় অমন বেশরমের মতো দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহীমা হাত নামায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপ্‌টে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ঐ তো কেবল মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে হুকা। গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহীমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো।

গ্রামের লোকেরা যেন রহীমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ– চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে-জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নিচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের জমি– সব জমি একান্ত আপন; কোনোটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি– তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে– তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, স্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকের পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা– ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে– মণ-কে-মণ।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহীমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের সামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা ভূত-পূজারী। তারা গুণাগার। জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা –এ কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

–কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিয়া। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে উঠে মজিদ বলে,

–হাসিও না মিঞা!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিলো। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

–আমি গরিব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে– গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

–কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি– যে দেশ ছেড়ে এসেছে, যে শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান –সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়তো।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

–ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কল্‌মা শিখবা। ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

–গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

–হইছে হইছে, ভাগ্।

একদিন ধাড়িধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

–কীরে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

–অর অয় নাই।

সে রেগে বলে, –অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ। বলে, পরশুদিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয় তবে মুশ্‌কিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,

–হেই কবে আমার খৎনা হইছে।

তারপর বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,

–ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হুজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয়নি। গর্জন করে উঠে বলে,

–তোল্ লুঙ্গি?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিলো, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিলো, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

–আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।

দাড়িগোঁফ ওঠা মদ্দের মতো ছেলে ঠির ঠির করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে। সারাটি দুপুর কোরবানীর ছাগলের মতো খুঁটিবন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারীও এসেছিলো ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়মড় করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মতো গান যখন ধরে, তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয়নি। ভাবতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারীকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

–আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠে বলে,

–আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই– তাঁনারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারীর পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা জোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারীর কান পর্যন্ত লাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেলো। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হলো। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিলো বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলো পাড়ার যত মেয়েরা– ছুকড়ি, জোয়ান, বুড়ি। রহীমা পর্যন্ত না দেখে পারলো না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা হাসলো।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রামে নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ অপরাহ্নে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে। সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহীমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করতো– সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা। রহীমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন– যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহীমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালু কাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে– না হয় লজ্জা, না হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এ সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অতর্কিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রূপালি ঝালর। রহীমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহীমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে– তার ওপর করুণা করো। যারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবজ্ঞা– অমর্যাদা, বিদ্রূপ। **অব্যক্ত–** অপ্রকাশিত। **অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা**– চোখের পানিতে ভেজা কৃতজ্ঞতা, গভীর কৃতজ্ঞতা। **অশীতিপর**– আশি বছরেরও বেশি বয়সের। **আকাশ বিশাল নগ্নতায় জলেপুড়ে মরে**– মেঘ বৃষ্টি হীন নীল আকাশকে লেখক এ উপমায় চিত্রিত করেছেন। **আত্মমর্যাদার ভুয়োঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্য–** গ্রামে জমিজমার অধিকারের সঙ্গে মর্যাদার সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি। তাই জমির প্রতি টান ও জমিকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপাত করতেও তাদের দ্বিধা নেই। জমির অধিকারের এ আত্মমর্যাদাকে ঔপন্যাসিক 'ঝাণ্ডা' বা পতাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিজের ভূখণ্ডে পতাকা উচিয়ে রাখার মতো এটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তবে এ আত্মমর্যাদার মধ্যে কিছুটা প্রবঞ্চনাও আছে। তাই লেখক এটাকে

'ভূয়ো' বা নিরর্থক বলেছেন। **আনপড়াহ**– যাদের কোন পড়াশোনা নেই। **আবছা আবছা**– অস্পষ্ট। যা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। **আমসিপারা**– আরবি বর্ণমালা এর উচ্চারণ সংবলিত সুরা সংকলন। কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। **আর্জি**– আবেদন, অভিযোগ। **ইদানীং**– আজকাল, সম্প্রতি। **উৎকর্ণ**– সজাগ। **কলতান করে**– উচ্চস্বরে এক সঙ্গে সুর মিলিয়ে। **কলমা**– মূল শব্দ আরবি 'কলমহ'। শব্দ, উক্তি, বাণী, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস পরিজ্ঞাপক উক্তি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদ রসুলুল্লাহ - আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই; মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। **কবর আজাব**– কবরে শাস্তি। **খোদা তালার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মত থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে**– মজিদের কুরআন তেলায়াতের ফলে এবং মাজারের রহস্যময় পরিবেশে তার প্রভাব পড়ার আলোকে মজিদের যুবতী স্ত্রী রহীমার মনে দারুন প্রতিক্রিয়া হয়। রহীমার মনের এ প্রতিক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক বিদ্যুতের আলোর ঝলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। **খরাপড়া**– অনাবৃষ্টি দেখা দেয়া। **খতম পড়াবার জন্য**– গ্রামে যখন অনাবৃষ্টি বা কোনো বিপদ আপদ দেখা দেয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআন পড়াবার ব্যবস্থা করে। কুরআনের ৩০ অধ্যায় পড়ে শেষ করাকে কোরান খতম করা বলে। এর মধ্যে যে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আসবে এটাই ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস। **গাট্টাগোট্টা**– শক্ত বাঁধুনিতে গড়া শরীর। **গুণাহ**– পাপ (ফারসি শব্দ)। **গোঁয়ার**– এক রোখা স্বভাবের। **গোস্বা**– রাগ (ফারসি শব্দ)। **ঘনায়মান**– যা চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে। **ঘাড়গুঁজে**– হাঁটুর ভেতর ঘাড় ঢুকিয়ে বসা। **চিকনাই**– উজ্জ্বলতা, সতেজভাব। **ছাপিয়ে ওঠা**– ভরে ওঠে। **জমায়েতের**– সমাবেশের, সভার। **জ্বলন্ত পেট**– ক্ষুধার্ত পেট। **জাহেল** (আরবি শব্দ)– মূর্খ। **জোয়ান মদ্দ**– যুবক ছেলে। **ঠির ঠির করে**– ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। **তাল পায় না**– কোনো কূল কিনারা পায় না, হদিস পায় না। **তাগড়া-তাগড়া**– মোটা তাজা, শক্তিশালী। **তারস্বরে**– তীব্র শব্দে। **দম খিঁচে**– নিশ্বাস বন্ধ করে। **দলাগুলো**– মাটির ঢেলা। **দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে**– সরু চিকন কাস্তে। **ধামড়া**– বয়স্ক। **ধাড়িধাড়ি ছেলে**– বয়স্ক ছেলে। **ধা করে**– হঠাৎ করে তীব্র গতিতে। **নছিহত**– উপদেশ। **নজর**– দৃষ্টি, মনোযোগ। **নির্নিমেষ চোখে**– এক দৃষ্টিতে, চোখের পলক না ফেলে তাকানো। **পক্ষপাতি**– চমকপ্রদ কোনো ঘটনা অত্যন্ত সহজেই গ্রামের সাধারণ লোকদের আকর্ষণ করে। তাই লেখক কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছেন গ্রামের লোকেরা নাটকের পক্ষপাতি। **প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা**– যার যৌবন উপচে পড়ছে। **পাথর হয়ে যায়**– নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে যায়। **বতোর দিনে**– ধান কাটার মৌসুমের দিনে। 'বতর্' শব্দটি কুমিল্লা, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ। **বে-এলেম**– বিদ্যাহীন, লেখাপড়া না জানা। **বেওয়া**– সন্তানহীনা বিধবা। **বেশরম**– নির্লজ্জ। **বেগানা-বেগায়ের**– অনাত্মীয়, অপরিচিত। **বুত পূজারী**– মূর্তি পূজক। **সিপাইর খণ্ডিত**– ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন। **মগরা মগরা ধান**– মগরা শব্দটি আঞ্চলিক। এখানে ভারে ভারে বা প্রচুর ধান ওঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **মদ্দ**– বয়স্ক পুরুষ। **'মরদ'** শব্দ থেকে এ আরবি শব্দটি এসেছে। **মর্মন্তুদ কান্না**– মর্মভেদকারী কান্না, যে কান্না হৃদয় স্পর্শ করে। **মহাতমিস্রা**– ঘোর অন্ধকার। **মাংসের মতো**– ঔপন্যাসিক জমির ঢেলা ঢেলা মাটির খণ্ডকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের টুকরো টুকরো একত্রিত মাংসখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ এ মাটির ঢেলার জন্যও যুদ্ধ হয়, হানাহানি হয়, প্রাণপাত হয়। **মাথায় ছিট**– মাথা খারাপ। **মুখে রা নেই**– নিঃশব্দ, নির্বাক। **যত্রতত্র**– যেখানে সেখানে। **যে খেলা খেলতে যাচ্ছে**– এখানে 'খেলা' শব্দের অর্থ এক ধরনের প্রতারণা, মিথ্যা ছল-চাতুরি। **রিজিক দেনেওয়ালা**– খাদ্য যোগানদানকারী। **রুঠা জমি**– নিস্ফলা জমি। **শক্তিমত্তা**– প্রচণ্ড শক্তি, গায়ের জোর। **শীর্ণ**– চিকন, সরু। **সন্নিবিষ্ট**– সঙ্গে লাগানো, সন্নিহিত। অনুর্বর জমি। **হাড় চওড়া**– শক্ত দেহের বাঁধন। **সাচ্চা**– পরিষ্কার। **হাস্নাহেনার মিষ্ট মধুর গন্ধ ছড়ায়**– মজিদের সুরেলা কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে মিষ্টি মধুর সুরের হাওয়া বইছিল লেখক তাকে যথার্থভাবে হাস্নাহেনা ফুলের স্নিগ্ধ খুশবুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

বাগধারা

মাথা হেঁট হওয়া– সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়া। **চোখে আগুন**– প্রচণ্ড রাগ। **চড়াই উতরাই ভাব**– বিক্ষিপ্ত মনোভাব। **আকাশে ভাসে**– দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

সারসংক্ষেপ

মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে মজিদ গ্রামের সবাইকে চমক লাগিয়ে দেয়। সে এসেই ধর্মে অবহেলার জন্য তাদের গালাগাল করে। গ্রামবাসী মজিদের তিরস্কারে বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা গ্রামের একটু বাইরে পুকুরপাড়ের একটা

বড়ো বাঁশঝাড়ের কাছে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শেওলাধরা কবর দেখেছে বটে, তবে এটা যে কোনো পীরের কবর হতে পারে তা তারা কোনোদিন ভাবেনি। অচেনা মৌলবী মজিদ এসেই প্রথম জানালো যে এটা মোদাচ্ছের পীরের কবর। মজিদ জানায় সে ময়মনসিংহের মধুপুরের গারো পাহাড়ে ভালোই ছিল। কিন্তু এতসুখ শান্তি ফেলে সে চলে এসেছে, কারণ– এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে মোদাচ্ছের পীর তাকে ডাকছেন। সে ডাকেই সে এখানে এসেছে। মজিদ মহব্বত নগরে এসেই বুঝে নিয়েছে এ অঞ্চল শস্যশ্যামল, অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে এখানে। কিন্তু লোকজন ধর্মকর্মের প্রতি অত মনোযোগী নয়। সুতরাং ওখানেই তাকে ঘা দিতে হবে। গ্রামের লোকজনের চোখে পানি দেখে সে বুঝেছে তার ওষুধ ধরেছে। দেখতে না দেখতে দীর্ঘদিনের জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। সেই অজ্ঞাত-অখ্যাত জীর্ণ কবর ঝালরওয়ালা লালসালুতে আচ্ছাদিত হয়ে নতুন হয়ে ওঠে। কবরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আসতে লাগল। এতে মজিদের কবর-বাণিজ্য আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল। মজিদের ঘর হলো, গৃহস্থালী হলো। মজিদ নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে নেয়। তারপর যৌবনদীপ্ত গ্রাম্য তরুণী রহীমাকে বিয়ে করে। মজিদ তাকে খোদার ভয় দেখিয়ে তার মনে প্রভাব বিস্তার করে। মজিদ দেখে গ্রামের লোকগুলো রহীমার মতোই। তাদের মধ্যে খোদার ভয় কম। জমি ছাড়া তারা কিছু চেনে না। খরার সময় জমি শুকিয়ে যায়। খরার পর, পানি সেচার ফলে যখন প্রচুর ধান জন্মে, গ্রামের মানুষ তখন হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে ধান কাটতে যায়। এ দৃশ্য দেখে মজিদের ভালো লাগে না। তার চোখে ভেসে ওঠে 'লালসালু'তে ঢাকা কবর। কারণ এটাই তার প্রধান সম্পদ। মজিদ গ্রামের লোকদের বলে ফসলের মাঠে ধান দেখে যারা ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হয়। তারা মূলত মূর্তি পূজক। তার কথায় কাজ হয়। গ্রামের ধর্মভীরু নিরীহ মানুষগুলো লালসালু আবৃত কবরের কাছে ফিরে আসে। সে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. মজিদের পূর্বের আবাস কোথায় ছিল?

ক. গারো পাহাড়　　খ. খাসিয়া পাহাড়
গ. ময়মনসিংহে　　ঘ. মধুপুরে

১০. গভীর রাতে মাজারের সামনে রহীমার বুক কেঁপে উঠে কেন?

ক. মজিদের ভয়ে　　খ. মাজারের ভয়ে
গ. মহাশক্তির ভয়ে　　ঘ. মানুষের ভয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ভক্তিবাদের জোয়ার এদেশে প্রবল। তাই এখানে পীর, দরবেশ, ফকির, সন্ন্যাসীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর এইসব ফকির , সন্ন্যাসীদের প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ে।

১১. উদ্দীপকের কোন দিকটির সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মিল রয়েছে?

ক. পীর, দরবেশের প্রতি বিশ্বাস　　খ. পীর, দরবেশের প্রতি অবিশ্বাস
গ. পীরপূজা, মাজারে অবিশ্বাস　　ঘ. পীরপূজা, মাজারে বিশ্বাস

১২. এরূপ সাদৃশ্যের পেছনে যে কারণ, তা হচ্ছে–

i . পীর-দরবেশের প্রভাব
ii. পীর-দরবেশের প্রতি অগাধ আস্থা
iii. অশিক্ষা ও কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হাসুনির মা ও তার বাবা-মায়ের জীবন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হাসুনির মা-বাবাকে ঘিরে মজিদের ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- তাহের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহীমার কাছে। যেমন আসে ধান-ভাননি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিলো, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

–আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহীমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

–আমার আর্জি– ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহীমা বলে;

–ক্যান গো বিটি?

–জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহীমা প্রশ্ন করে,

–তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

–তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু। রহীমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

–আমার এক আর্জি বুবু।

–কও?

ওনারে কইবেন– বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহীমা প্রশ্ন করে,

–ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

–হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ-ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হানে।

–ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী– হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে– আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

–হুনছস্ কথা, হুনছস্?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

–ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

–থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহীমাকে এসে বলে কথাটা।

–হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক– নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার। হঠাৎ সমবেদনায় রহীমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

–তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুঃস্থা মেয়ে। স্বামীর মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনতিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহীমা বলে,

শ্বশুর বাড়িতে যাওনা ক্যান?

–অরা মনুষ্যি না।

–নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রঙ ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

–শরীলে রঙ ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

–খানকির বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে– গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিতো।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুষকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে, –তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধম্‌কে ওঠে।

–কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

–তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যাম্‌নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারি গলায় বলে,

–আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মদ্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনো হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেতো– যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিতো। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

–বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান–

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

–বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোনো দিন কয় তাইলে মছিবৎ হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

–হুজুর, কোত্থিকা হুনলেন বেটির কথা?

–তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো– কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিলো। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি– যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়তো তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিলো সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটতো মুখ দিয়ে আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কি বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না– তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দু মাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে। এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিলো, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হতো কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিলো। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিলো। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিলো যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার

করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা– ওরে ভাতার খাইকা জারুনি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিলো না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিলো না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেলো মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর, সে-ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহীমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহীমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিলো। প্রথমে কিছু বোঝা গেলো না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহীমাকে বলেছে; ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুকা টানে আর চেয়ে-চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে– এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহীমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এ জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহীমাকে বলে,

–অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহীমা বলে,

–ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গাম্ভীর্য কণ্ঠে বলে, –থাক তাইলে এখানে।

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা, আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তিবিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

–তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

–হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবারে ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

–এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো– এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

–এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়– তা বইলা আমি কী পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে উঠে বলে,

–কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে, –কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও। বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,

–তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?

–আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি! –লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে– বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিলো সে, এবং ভেবেছিলো তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস্ করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করবার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষগুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তাও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরি বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে– তারা এসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

–পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর বাণী-এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব– যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। হজরতের এতো পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগলো। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা'লা মানবজাতিকে বললেন–

থেমে বিসমিল্লা পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিলো, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে

কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুনাহ্ বড় মস্ত গুনাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

–তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস্-ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ– এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচতো, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিলো সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারতো। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাতো না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিলো, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস– তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

–কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিঃশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

–কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

–কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

–তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাতে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছট্‌ফট্ করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

–তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পয়সার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সে কথার সত্যাসত্য

সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ চেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধুলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠে না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

–দেখ্‌তো, ব্যাটা কি মরলো নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে, কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

–তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

–বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মার হৈ-হৈ করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

–আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়া-কটা গলাধঃকরণ করে, বলে,

–পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে। বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়।

তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

–আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে, –মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হুহু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেলো। কেউ বলতে পারলো না গেলো কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াৎ শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

–আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা–।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ– যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে– সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কি না জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম মৃত্যু ফসল হওয়া না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিলো, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিলো– যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়– সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

–খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে। বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসতো না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসতে লাগলো। কখনো ক্বচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতো,

আর বুকটা দুরুদুরু কাঁপতো ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেলো। মজিদের হাতে হুকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

–হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে-ক্রমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষতো রহীমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহীমাকে বলে,

–ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহীমা রুষ্ট স্বরে বলে,

–অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

–আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনিরে একটা জামা দিলে ও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহীমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসতো। আজ হাসেও না।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অন্ন ধ্বংস করা– খেয়ে দেয়ে শেষ করা। **অগ্নিদৃষ্টি–** রাগান্বিত চোখে তাকানো। **আমতা আমতা করে**– কী করবে বুঝতে না পেরে সংকোচ বা ইতস্তত করা। **আপসিপানা মুখ–** শুকিয়ে যাওয়া মুখ। **আশ মিটিয়ে**– আশা বা সাধ পূরণ করে। **আড়ি পেতে শুনবে**– চুপ করে অগোচরে ওৎ পেতে শোনা। **উদ্ধত–** অবাধ্য, গোঁয়ার। **ঋজু ভঙ্গিতে–** সোজাভাবে বসা। **কুদরাত–** শক্তি, লীলাখেলা। **কুৎসা–** অপরের নামে বদনাম রটানো। **খচ করে ধরে**– মনে কাঁটার মতো বিধে যায়। **খালাস হমু**– মুক্তি পাব। **খোদাতালার ভেদ–** খোদাতালার সৃষ্টির রহস্য। **খোদাবন্দ**– খোদার বান্দা থেকে শব্দটি এসেছে। খোদারভক্ত। **গর্হিত–** নিষিদ্ধ। **গুজরান**– অতিবাহিত করা, কাটানো। **ঘূর্ণি খেয়ে–** চক্কর মেরে বা ঘোরান দিয়ে। **ঠ্যাঙাইছ–** মেরেছ। মূল শব্দটি ঠেঙানো, সেখান থেকে আঞ্চলিক প্রয়োগে ঠ্যাঙাইছ হয়েছে। **ঢেঙা–** লম্বাটে, লম্বা। **ঢোল-সোহরত–** কোনো বিষয় ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়া বা প্রচার করা। **তালাশ–** খোঁজ, অনুসন্ধান। **দিলে ময়লা নাই–** অন্তরে খারাপ কিছু নাই। **দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ–** দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী বুঝাবার জন্য এ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। **দুনিয়ার থন (আঞ্চলিক শব্দ)**– দুনিয়ার থেকে। **দেমাক–** মূল শব্দ আরবি দেমাগ্ বা দিমাগ্। অহংকার, গর্ব, এখানে বিগড়ে গেছে বা বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে এ অর্থে ব্যবহৃত। **নিত্য নিয়ত–** সদাসর্বদা। **পরবদ্দেগার (আঞ্চলিক শব্দ)–** প্রকৃত শব্দ পরওয়ার দিগার, ফার্সি এ শব্দের অর্থ দয়াময় আল্লাহ। **প্রক্ষিপ্ত–** নিক্ষিপ্ত, বেরিয়ে আসা। **প্রত্যুত্তর মুখে বিষ**– কদর্য ও অশ্রাব্য ভাষা যা বিষের মতো কটু। **পুলক**– আনন্দ। **ফুরণ**– ফোড় দেয়া। **বাজখাঁই–** অত্যন্ত গম্ভীর ও কর্কশ আওয়াজ। **বালা–** (আরবি শব্দ) আপদ-বিপদ। **ব্যাক্কই**– সকলেই (আঞ্চলিক শব্দ)। **বিভ্রান্ত–** হতবুদ্ধি। **মোহিত–** মুগ্ধ। **রক্ত চড়চড় করে ওঠে–** রাগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। **রদ্দি–** (আরবি শব্দ) নিকৃষ্ট বা অচল। **রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্তব্ধতা–** নিঃশ্বাস বন্ধ বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো নীরবতা। **রোশনাই–** আলো। **লেলিহান–** দাউ দাউ করে জ্বলা। **শয়তানের খাম্বা–** খাম্বা' শব্দটি হিন্দি 'খম্বা' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। এখানে হাসুনির মার বাপ অর্থাৎ তাহেরের বাপকেই মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার বৃদ্ধা স্ত্রী সঙ্গে সদাসর্বদা ঝগড়া লেগেই আছে। এদিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা এসে মজিদের কাছে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়। তাহেরের বাপ একটু বোকা ধরনের লোক, প্রতিবাদী। মজিদের এটা মোটেই পছন্দ হয় না। তাই তার দৃষ্টিতে দীর্ঘ এ লোকটা যেন শয়তানের প্রতিমূর্তি। **শুধায়**– জিজ্ঞাসা করে। **সর্বসমক্ষে–** সকলের সামনে। **সমস্বরে**– একই সঙ্গে শব্দ করে। **সোপর্দ**– সপে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া। **হলফ–** প্রতিজ্ঞা।

সারসংক্ষেপ

তাহের-কাদেরের বোন হাসুনির মা বিধবা। সে মজিদের স্ত্রী রহীমার কাছে এক আবেদন নিয়ে আসে। তার বৃদ্ধ বাবা মা সারাক্ষণ গালাগালি, ঝগড়াঝাটি ও মারামারি করে। ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় তার ছেলেপুলের জন্ম নিয়েও কথা তোলে। এসব শুনে রহীমা তাকে সান্ত্বনা দেয়। হাসুনির মার কথার সূত্র ধরে মজিদ তার বাপকে ডেকে পাঠায়। বুড়ো ভেবে অবাক হয় ঘরের কথা পরে জানল কীভাবে। হাসুনির মা ছাড়া মজিদের বাড়িতে তো কেউ আসে না। বাড়িতে ফিরে হাসুনির মাকে বেদম পেটায় সে। হাসুনির মা মার খেয়ে মজিদের ওখানে ছুটে গিয়ে মরাকান্না জুড়ে দেয়। মজিদ বলে হাসুনির মার ব্যাপারটা সে দেখবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মজিদের দরবারে বিচার বসে। এ বিচার সভায় মজিদের সর্বকর্মের সহায়ক খালেক ব্যাপারীও আসে। মজিদ ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে সুরেলা ভাষায় কুরআনের সুরা পড়ে সবার মন ভিজিয়ে তোলে। তারপর তার অনুকূলে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলে বুড়ো তাহেরের বাপকে সরাসরি প্রশ্ন করে বুড়ির কথা সত্য কি না? বুড়ো এবারও অবাক বিস্ময়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। বুড়ির যৌবন বয়সে তাদের সংসার জীবনের প্রথমে তার স্ত্রী সম্পর্কে একটা কথা উঠেছিল বটে, তবে সেসব কথা সে তখন পাত্তা দেয়নি। মজিদ নানাভাবে ঘুরে ফিরে তার মুখ থেকে সেসব কদর্য কথা বের করে আনতে চায়। অবশেষে বৃদ্ধ লোকটি অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ এবার খুশি হয়। সে বলে ভালো মন্দের বিচার খোদা করবেন। তবে বুড়ো যেন তার মেয়ের কাছে মাফ চায়। এ ঘটনার পর বুড়ো বাড়ি গিয়ে মনের দুঃখে শুয়ে পড়ে। রাগে ও অপমানে ছটফট করে। তবুও বুড়ো মেয়ের কাছে ক্ষমা চায় একদিন ঝড়ের সময়। হাসুনির মা অবাক হয় বাপের এ ক্ষমা চাওয়ায়। এ ঝড়ের মধ্যে বুড়ো এসময় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সবাই ভুলে যায়। হাসুনির মাও বাপের কথা আস্তে আস্তে ভুলে গিয়ে মজিদের সংসারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. হাসুনির মা কী আর্জি নিয়ে মজিদের কাছে আসে?

ক. নিজের মওতের
খ. সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায়
গ. ধনদৌলত পেতে
ঘ. স্বামীর মৃত্যুর

১৪. "শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?"– বাক্যটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

i. উপহাস
ii. বিদ্রূপ
iii. পরিহাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে প্রিয়াংকা বাবার বাড়িতে থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতিদিনকার ঝগড়ায় সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর না পেরে সে অভিযোগ জানাতে যায় স্থানীয় পৌর কমিশনারের কাছে।

১৫. উদ্দীপকের প্রিয়াংকার সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আমেনা বিবি
খ. হাসুনির মা
গ. তানু বিবি
ঘ. জমিলা

১৬. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

i. বিধবা মেয়ের বাপের বাড়ি থাকতে নেই
ii. মা-বাবার ঝগড়া পছন্দ নয়
iii. বৃদ্ধ মা-বাবার ঝগড়ার বিচার চায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদের আকর্ষণে তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুড়ো পীরের প্রতি আকৃষ্ট লোকদের মজিদ কীভাবে তার প্রভাবে নিয়ে এল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহীমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাঁপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে সিরসির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহীমাকে সে লক্ষ করেনি, সে-রহীমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহীমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

–পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহীমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

–ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করণ লাগবো।

–থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে-মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কী কোনো কথা? তারই দেয়া বেগুনি রঙের শাড়ি পরা মেয়েলোকটিকে– খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল করছিলো উজ্জ্বল লালিত্যে– তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহীমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিলো, ধান সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সেও তাকায় না রহীমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পুব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যূষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোনো পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তাঁনার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ! কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়– বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজ কামকে অবহেলা করতে বলেননি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

–ব'লে মজিদ চোখ পিট-পিট করে– যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

–খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারি করে। কিন্তু আবার দুমুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কা করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে-থেকে। গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহু ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

–তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতি-বিতি করে বলে,

–যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মন ধান হলে অন্তত একশ মন বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয় নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না উঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। –গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পীর সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিলো তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একথা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ-দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই– কেবল বৃহৎ খড়গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোনো এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে গল্প তাঁর রুহানি তা'কত ও কাশ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোন্‌কার মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রূহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজিদ নিশ্চিত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। এতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তার নূরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝল্‌সে যায়, কারো এমন চোখ ভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহীমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে– আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহীমা হঠাৎ বলে,

–এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

–মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহীমা দমে গেলো। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহীমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

একসময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথার খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কি যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা উঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহীমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহে ঘেষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলো তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির সামনেকার মাঠটা লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে-পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে-তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিয়া হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়তো তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা করে, কারো-বা আবার ডুকরে কান্না আসে। কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধ ঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে, এমনি সময় হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠলো। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো। –পীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন– সোহবতে তোয়ালে তুরা তোয়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে) –তখন গোটা জমায়েতের সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও করে ফেললো। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারলো ধরলো, –কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটলো। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এ আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠলো পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আর তা-শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠলো। সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এ মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারি পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনের দ্রুতবিস্তারের মতো পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না দেখতে ছড়িয়ে গেলো। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিলো, এবার তারা মরা-কান্না জুড়ে বসলো। পীর সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারি ঢেউ-এর মতো সম্মুখে ভেঙে এলো জনস্রোত। অনেক মরা-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

–ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেলো।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠলো। শত শত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

–যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এলো। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো,

–চেঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

কোন্ নামাজ হইলো এটা?

–কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া। উত্তর শুনে আবার চিৎকার করে গালাগাল শুরু করলো মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায়

বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস ছেকে ছায়া আছলি এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেলো না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিলো তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যে ছিলো।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বলে,

–কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলো। কারো কারো মনে ভয়ও হয়েছিলো– এ বুঝি পীর সাহেবের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এলো।

মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ দিয়ে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করলো, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসলো। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করলো– ভাই সকলরা সকলে অবগত আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভণিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। –আউয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ নিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিক-ই আছে– যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে পড়বে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্যে তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ– যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেননি– তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ্ করছেন।

এ পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাই গলায় প্রশ্ন করে, হুনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেলো যে না, তা নয়। কিন্তু গেলো অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেলো দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জে গেলো। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো, বেহেস্ত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করলো কতক্ষণ।

কালু মিঞা গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যান্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে, বলে, –পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব। ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথম দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকতে ঝাঁকতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিঞার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

–কোন চিন্তা করবানা মিঞা। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদরযত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিলো না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রূষার শেষ নাই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বসেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কিনা তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে– বড়াই করার ভাব গোপন রাখে। **অশ্রাব্য–** যা শোনার যোগ্য নয়। **আছলী–** পুরো, অবিকল, সঠিক। **এস্তেমাল**– ব্যবহার করা। **কম্পাউন্ডার–** ডাক্তারের সহকারী, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী যে লোক ওষুধ তৈরি করে। **কাতার–** সারি, লাইন। **কাশ্‌ফ**– উন্মোচিত। **কালো মাথার সমুদ্র–** অনেক লোকের মাথা এক দৃষ্টিতে কালো সমুদ্রের মতো দেখায়। **কারসাজি–** কৌশল, ফন্দি। **কাহে? জ্বোহরকা নামাজ হুয়া–** কেন? জোহরের নামাজ হয়েছে। **কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের–** অত্যন্ত চোট ও ক্ষণ স্থায়ী। **খড়্গনামা গৌরবর্ণ চেহারা–** ধারালো নাক আর সুন্দর উজ্জ্বল রঙের চেহারা। **খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায়–** পাগলা, বা উত্তেজিত কুকুর যে রকম তীক্ষ্ণ ভাবে ডাকে। **চরিতার্থ–** সফল। **চেঁচামেচি করতা কিছকা ওয়াস্তে–** কী জন্য চেঁচামেচি করছ। **জন সমুদ্রের উত্তাপ**– অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকতে জায়গাটা গরম হয়ে ওঠেছে। **জবান–** ভাষা। **জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে–** রাগের মধ্যে জ্বালা আছে, কিন্তু রাগের উদ্দেশ্য মানুষগুলোকে সুপথে আনা। **জেহাদি জোশ–** ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা। **তওবা–** মুসলমান ধর্মমতে প্রায়শ্চিত্ত। **তকলিফ**– কষ্ট। **তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুযটারে–** তখন তোদের পীর সূর্যটাকে ধরে রাখতে পারলো না? **তানার দোয়া–** এখানে লালসালুর নিচে শায়িত বলে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের কথা বলা হয়েছে। **তামাক গন্ধ ভারী বুকের হাওয়া–** পীর সাহেব প্রায় সময় যেহেতু সুগন্ধী তামাক পানে রত থাকেন তাই তাঁর দোওয়া চাওয়ার জন্য যে কেউ কাছে গেলেই বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেই মিষ্টি গন্ধে আবিষ্ট হতে হয়। তামাকের সেই মিষ্টি গন্ধটা যেন পীর সাহেবের বুক থেকে বেরিয়ে আসে। **তোয়াক্কল–** ভরসা বা নির্ভর। **দ্রুত বিস্তার–** তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাওয়া। **দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে**– অনেক দূরের সীমানায়। **দীনতাবোধ–** নিজেকে ছোট মনে করা নিজের ক্ষুদ্রতাবোধ। **দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়–** পীর ও মজিদ এ দুইয়ের মধ্যে কাকে তারা মানবে সেই দ্বন্দ্ব তাদের মনে আসে। **নাগাল–** ধরা ছোঁয়া। **নিতিবিতি করে–** সংকোচ ও ইতস্তত করে। **নূরানী চেহারার দীপ্তি–** পীর সাহেবের চেহারার মধ্যে যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা তাকে নূরের ছটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **নির্ণীত করা**– স্থির বা ধার্য করা, ধরে নেওয়া। **প্রলুব্ধ করবার জন্য–** লোভ দেখানোর জন্য। **পাখা সঞ্চালন–** পাখা চালনা বা নাড়ানো। **বজ্রনিনাদ**– মেঘের প্রচণ্ড শব্দের মতো কণ্ঠের আওয়াজ। **বয়েত–** শ্লোক। **ব্যাণ্ডেজ–** ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্য কাপড়ের পট্টি। **বাজখাঁই–** উঁচু ও কর্কশ আওয়াজ। **বাতরসস্ফীত পদযুগলে–** পীর সাহেবের মোটাসোটা ফোলা পা। লেখক ব্যঙ্গ করে পীরের পায়ের মোটামোটা রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, বাতরসের জন্যই পীর সাহেবের পা দুটো অত মোটা।

বেদাতি– ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির বাইরের কোন কিছু। **বেশরিয়তি–** ইসলাম ধর্মের আইন বিরুদ্ধ। **বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার–** মিথ্যা আশ্বাস ও নানা প্রলোভনের দোহাই দিয়ে সরল লোকজনকে আকৃষ্ট করে ফেলা, অনেকটা মায়াজালে আবদ্ধ করার মত। **ভাবমত্ততা–** ভাবের পাগলামি। **মকরুহ–** গর্হিত, নিষিদ্ধ। **মনোমুগ্ধকর–** মনকে যা মুগ্ধ করে। **মরা কান্না–** কেউ মারা যাওয়ার সময় নিকট জনেরা যেভাবে কাঁদে। **মূর্তিবৎ–** মূর্তির মতো। **মুখ খিস্তি–** মুখ বিকৃত করে খারাপ কথা বলা। **রুহানি তাকত**– আত্মার শক্তি। **লেজুড়–** লেজ (আঞ্চলিক শব্দ)। **শঙ্কিত–** ভীত। **শত সহস্র সাপ শিস দেয়**– গনগনে আগুনের উত্তাপে যে ধোয়া হয় এবং ভাষা ওঠে তাতে এক ধরনের শব্দ হয়। লেখক এই শব্দকে সাপের শিস দেয়ার শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ তুলনা আগুনের ভয়াবহতার সঙ্গে মজিদের মনে জাগ্রত কামুকতার চিত্র বলে ধারণা করা যায়। **শাহি কাণ্ডকারখানা**– বিরাট আয়োজন। **শোকর গুজার করবার ভাষা–** আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দোয়া, যে ভাষায় ও প্রশংসায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেরকম ভাষা। **সর্বজনবিদিত–** সকলের জানা।

সারসংক্ষেপ

পৌষ মাসে নতুন ধান আসে মজিদের ঘরে। মজিদ বলে আল্লাহর রহমতেই এসব হয়েছে, তার ওপর রয়েছে লালসালুতে আবৃত কবরের নিচের মোদাচ্ছের পীরের বিশেষ দোয়া। মজিদের স্ত্রী রহীমা আর হাসুনীর মা রাত জেগে ধান সিদ্ধ করে। মজিদ তার কাছে আসা লোকজনদের খোদাতালার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। কিন্তু এসব মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় তার মনের গভীরে ভাসতে থাকে হাসুনির মায়ের চেহারা। যে বছর গ্রামে প্রচুর ধান হয় সে বছর পীরের আগমনও ঘটে বেশি। এবারও তিন গ্রাম দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁর বাড়িতে এক বিরাট পীর এসেছেন। পীরের আগমনে চারদিকে যে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে মজিদ তা টের পায়। সবাই ছুটছে ঐ পীরের কাছে। মজিদ রাতে রহীমার মুখে সেই পীরের কথা শুনে জ্বলে ওঠে রাগে। এবার সে শঙ্কিত না হয়ে পারে না। একদিন মজিদ ঐ পীরের আস্তানায় যায়। গিয়ে দেখে অসংখ্য লোক। মতলুব মিয়া হুজুরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, তাঁর ক্ষমতা এত বেশি যে তিনি সূর্যকেও ধরে রাখতে পারেন। জোহরের বেলাশেষে পীর সাহেবের লোকেরা জোহরের নামাজ পড়ার জন্য সবাইকে কাতারে দাঁড়াতে বলে। মজিদ এবার চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। পীরের লোকেরা লাঠি দিয়ে মেপেও জোহরের নামাজের সময় বের করতে পারে না। মজিদ তখন মুখ খিস্তি করে পীরের ক্ষমতা নিয়ে কটাক্ষ করে। আর মহব্বতনগরের লোকদের নিয়ে ফিরে আসে। মজিদ গ্রামের লোকজনকে বোঝায় যে, পীর সাহেব মানুষকে বিপথে নিচ্ছে। মহব্বতনগরের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে পীরের আস্তানায় হামলা করতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। খবর শুনে মজিদ তাদের দেখে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. পীর সাহেবের প্রধান মুরিদের নাম কী?

ক. ধলা মিয়া খ. মতলুব খাঁ গ. আক্কাস আলি ঘ. খালেক ব্যাপারি

১৮. মজিদের রাতে ঘুম হয় না কেন?

ক. জাঁদরেল পীরের আগমনে খ. সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়
গ. বাড়ি ছেড়ে আসায় ঘ. হাসুনির মা প্রশ্রয় না দেয়ায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গতমাসে শুয়াগ্রামে একজন নতুন পীর এসেছেন। পীর সাহেব বড়ই কামেল এবং একজন পরহেজগার মানুষ। ফলে দলে দলে গ্রামের লোক তাঁর নিকট আসতে থাকে। এতে স্থানীয় মোল্লা-মৌলভিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

১৯. উদ্দীপকের পীর সাহেবের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. আওয়ালপুরের পীর খ. খালেক ব্যাপারি গ. ধলা মিঞা ঘ. কাদেরের পীর

২০. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হল–

i. সবলের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয় ii. প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা iii. প্রতিপক্ষের আবির্ভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আমেনা বিবির জন্য পীর সাহেবের পানি পড়া নিয়ে আসা সম্পর্কিত ঘটনাটি বিবৃত করতে পারবেন।
- আমেনা বিবির সন্তানলাভের উপায় হিসেবে মজিদের মতলবের একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও সচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘ পথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পান্‌সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাত দিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিলো না। তার প্রধান কারণ তাঁর জইফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গি ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উল্‌টো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাগরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেতো, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিলো যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গা-টা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষ কাটালে। যৌবনের দিক থেকে সে তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাঙ না হলেও একেবারে টস্‌কানো নয়, বোচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছ্যাতা পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রঙ ধবধব করে; নাকে সতীনের মতো জ্বলজ্বলে নাকছাবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকলো। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মতো সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশ্‌কিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসলো। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া

হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সাবের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজ্বারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, –তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, –আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ-এর খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধতো না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভূর-চাষা-মাঠাইলারা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা সচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক– যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্‌টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। এক জনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবি কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে-বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলামিঞা। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়-দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। কচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কী হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন ধলামিঞা।

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অশ্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

–কী কাম দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথমে বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে– যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রাম থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়া পানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এই যে, শেষপর্যন্ত কোনো ছেলে-পুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরুব্বি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুরুব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

–কী গো ধলামিঞা, বুঝলান নি আমার কথাডা?

–জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাৎ করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিলো যে, যে-সব দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের

ফাড়াটা কাটলেও ঐখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাৎ সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা ধলা মিঞা।

–ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

–জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

–আরেক কথা। কথাডা যানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

–তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুকায় টান দিচ্ছিলো, হঠাৎ সেটা নাবিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢঙ দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়– তার ভ্রুক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

–আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভণিতাসহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলো, তারই ওপর রঙ ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিঞাকে ডেকে বলে দিলে, আওয়ালপুরে গিয়ে পীরসাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

–তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিঞা হঠাৎ ফিচ্‌কি দিয়ে হাসে।

–আওয়ালপুর গেলে কী আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি পড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব? –আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা– আর কথাডা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

–কী কন?

–কী আর কমু এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিঞার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিঞা বলে,

–আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

–যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্ট স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিঞা যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিঞা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

–হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামু নে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিঞার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

–তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুমনে পানি পড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,

–না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিঞা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ করে সে-ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য– সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো।

ধলামিঞা ভারিমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নোতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু-জনে গরু-ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহীমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধুমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

–হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সট্‌কাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

–কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধ্বসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

–তাইলে আর তাঁনার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

–লোক পাঠামু তাঁনার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখদুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধ্বসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারী বলে,

–হেই কথা আমি ভাবতাছি। আছে কী না আছে – হুদাহুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝান আর কী। ঠগ-পীরের পানিপড়ায় কি কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে-বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়– শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে– ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলামিঞারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তাঁনার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই–

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

–খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কি জোর নাই?

–আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

–কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কী, তাগো কথা হুনলে পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মস্ত গোঁফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

–ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কী করি এহন । কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

–তাঁনারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নোতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

–পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দো। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দ প্যাঁচ!

ব্যাপারী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

–আমার বিবিরডা ছাড়ান যায় না?

–ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবো কয় প্যাঁচ তাঁনার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে– তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহ্‌রি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যাথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

–আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

–তয় বুঝতে হইব যে, তাঁনার চোদ্দ প্যাঁচ কী আরো বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়-চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

–কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিলো সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাস-খানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিলো মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

–কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

–মা মরছে।

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

–আহা, ক্যামনে মরলো গো বিটি?

–এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

–ছ্যামরারা কই?

–আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

–দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছে নি?

–করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়বো।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

–মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

–মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না।

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুঁকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে কবরে লোক-চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে– এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

–মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাধে। থেমে বলে,

–খোদা তারে বেহেস্তে-নছিব কর, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অন্দর– ভিতর বাড়ি। **অন্তরালে–** আড়ালে। **অসংলগ্ন**– এলোমেলো। **অস্বস্তিকর**– অশান্তিপূর্ণ। **আফসোস**– অনুতাপ, দুঃখ। **আস্তানা–** স্থান। **আবক্ষ–** বুক পর্যন্ত। **আলগোছে**– আস্তে করে। **ঈমানদার–** বিশ্বাসী। **উপলব্ধি করা–** বোঝা। **উৎকণ্ঠিত**– চিন্তিত, ব্যাকুল। **উদরাঞ্চল–** পেট। **উদ্বেগ**– দুশ্চিন্তা। **কল্লা–** মাথা। **কালাম**– বাণী। **কিছিম–** ধরন। **কেরায়া**– ভাড়া। **খচখচ**– অস্বস্তির ভাব। **খড়কুটো**– শুকনো ঘাস। **খাড়া হয়ে দাঁড়ানো**– নিজের মতো কাজ করা, নিজের শক্তিতে দাঁড়ানো। **খেদমতে–** সেবায়। **খোদ–** স্বয়ং, নিজেই। **গলা ধ্বসে যাওয়া**– গলা দিয়ে শব্দ না আসা। **গাভুর**– চাকর, শ্রমিক। **গুণচর্চা–** গুণের প্রশংসা। **ঘাবড়াবার**– ভয় পাওয়ার। **চাঙ্গা–** সজীব। **চেলা**– শিষ্য। **ছ্যাতা**– ছত্রাক, ময়লা দাগ। **ছিলিম–** এক কল্কে তামাক। **জঈফ**– অতি বৃদ্ধ, শক্তিহীন। **জোব্বা জুব্বা–** জোব্বা ও জুব্বা একই অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ লম্বা আলখাল্লা জাতীয় ঢিলে জামা। **জো–** উপায়। **টসকানো–** দুমড়ানো। **ঠাহর–** অনুমান, খোঁজ। **ত্রিসীমানায়**– কাছে কিনারে। **দজ্জাল–** দুষ্ট, অত্যাচারী। **দরদ–** সহানুভূতি। **দাঙ্গাবাজি–** মারপিট। **দানাপানি**– খাদ্য। **দাফন-কাফন**– মৃত মানুষকে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে কবর দেয়া, মৃতদেহের সৎকার। **দিগন্ত–** আকাশ ও মাটির মিলন রেখা। **দেবংশি–** দেও-দানবের অংশ, ভুতের আশ্রয়। **ধড়–** শরীর। **ধাক্কা সামলানো–** স্বাভাবিক হওয়া। **নগ্ন দৃষ্টি–** খোলা চোখ। **নিমরাজি**– অর্ধেক রাজি। **নিরস্ত**– ক্ষান্ত। **নিস্পৃহতা–** ইচ্ছার অভাব। **নাকছাবি–** নাকের অলংকার। **নানি বুড়ি**– নানি দাদী জাতীয় গ্রাম্য ধাত্রী। **নিরালা**– একলা, নির্জনে। **নির্বিবাদে**– শান্তিতে। **নিস্তার–** অব্যাহতি। **নিস্পন্দভাবে**– প্রাণহীনভাবে। **নীল হয়ে ওঠা–** যন্ত্রার প্রকাশ। **পলক–** অতি সামান্য সময়, চোখের পাতা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। **পাক ধরেছে**– পেকে উঠছে। **প্রতিপত্তিশালী–** শক্তিমান। **প্রতিপত্তি**– ক্ষমতা, দাপট। **ফিকির ফন্দি**– কৌশল, বুদ্ধি। **ফিচকি দিয়ে হাসা**– দুষ্টের মতো হাসা। **ফি-বৎসর**– প্রত্যেক বৎসর। **বরখেলাফ**– অমান্য। **বজ্রাহত**– বাজ পড়েছে এমন। **বিসদৃশ–** উল্টাপাল্টা। **বেঠিকপানা–** ভুলযুক্ত। **বেমালুম**– অগোচরে, অজ্ঞাতে। **বেহেস্ত-নছিব**– বেহেশ্‌তে যাওয়ার ভাগ্য। **বেড়ি–** বেষ্টনি, বন্ধনি। **ব্যারাম–** অসুখ। **ভাটির দেশ**– নদী বিধৌত অঞ্চল, বাংলাদেশ অর্থে। **ভারি মুখ**– বেজার, অখুশি মুখ। **মর্মার্থ**– মূল কথা। **মতলব**– উদ্দেশ্য। **মনের কথা পড়া**– মনের ভেতরে কী আছে তা জেনে ফেলা। **মনে ধরা–** মনে কষ্ট পাওয়া। **মাঠাইল**– মাঠচাষী। **রেস্তা–** সম্পর্ক, আত্মীয়তা। **লেবাস মুক্ত**– পোশাকহীন। **শানদার**– উজ্জ্বল, জৌলুশপূর্ণ। **শুদ্ধচিত্তে–** পবিত্র মনে। **শ্বসন–** শ্বাস-প্রশ্বাস। **সঞ্চালন**– নাড়ানো, চালানো। **সন্দিগ্ধ**– সন্দেহযুক্ত। **সাকরেদ**– শিষ্য। **হদিশ–** সংবাদ, খবর। **হাহাকার**– দুঃখ, শোক।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

উপন্যাসকে জীবনধর্মী করার জন্য চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়। 'লালসালু' একটি বাস্তব জীবনধর্মী উপন্যাস, সেজন্য এ উপন্যাসেও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। আপনি 'লালসালু' উপন্যাসের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি ভালো করে দেখুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।

'লালসালু' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সবাই গ্রামের, সুতরাং এটা স্বাভাবিক। ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার চমৎকার ব্যবহার করেছেন। মজিদ মাজারের খাদেম এবং একজন মোল্লা। তার মুখের কথা মোল্লা-মৌলবির মতো হয়েছে; এতে মাঝে মাঝে আরবি ফারসি শব্দের মিশেল আছে। গ্রামের অন্যান্য চরিত্রের সংলাপও যথাযথ হয়েছে। 'লালসালু' উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলের ভাষা সে প্রশ্ন করা যায়। আমাদের মনে হয়, ঢাকা অঞ্চলের ভাষার আদল এতে আছে। এ-ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ প্রায় ক্ষেত্রে অপিনিহিতজাত, –যেমন 'পড়ে'র বদলে পইড়া, 'করে'র বদলে 'কইরা',, 'কেঁদে কেটে' হয় 'কাইন্দা কাইটা', এ ছাড়া রয়েছে 'করতে'র বদলে 'করবার', নেওয়ার বদলে নিবার, যাবো'র পরিবর্তে 'যামু, 'স'র জায়গায় 'হ', যেমন 'সেই'-এর বদলে 'যেই', শুনি হয় হুনি, সর্বনাম 'তিনি' ও তাঁর 'তানি' ও 'তানার' আমাদের বদলে 'আমাগো, নির্দেশক টা ও টি যথাক্রমে 'ডা' ও 'ডি'- যেমন কথাটা 'কথাডা, ছোটটি ছোডডি প্রশ্নবোধক কেন হয় ক্যান, অব্যয় যেন ও থেকে হয় 'যানি' ও থিকা ইত্যাদি। আঞ্চলিক শব্দ তো আছেই, যেমন ছেলে অর্থে 'ছ্যামরা', শরীর অর্থে 'শরীল' আঞ্চলিক কথ্যবুলি উচ্চারণের টানটুনে বেশি স্পষ্ট হয়। আঞ্চলিক শব্দ, বাকরীতি ও উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে আঞ্চলিক ভাষার রূপ ফুটে ওঠে। আপনারা 'লালসালু'র আঞ্চলিক ভাষারীতি লক্ষ করুন :

আইনা– এনে। **আইচ্ছা**– আচ্ছা। **আছিল**– ছিল। **আহি**– আসি। **এহন**– এখন। **এ্যামনে–** এমনি। **কথাডা**– কথাটা। **কইবার পারি না**– বলতে পারি না। **করবার**– করতে। **কইয়াও দেখলেন না**– বলেও দেখলেন না। **কথাডা ঠিক কইছেন**– কথাটা ঠিক বলেছেন। **করতাছে নি–** করছে কী? **কাইন্দা কাইটা**– কেঁদেকেটে। **কাম**– কাজ। **কী আর কমু**– কি আর বলব। **কেলা**– কলা (তুচ্ছার্থে)। **ক্যান**– কেন। **খোলন**– খোলা। **গেছে গিয়া**– চলে গেছে। **চাইপা**– চেপে, গোপন করে। **চাপাচাপি**– গোপন করে। **ছ্যামরারা কই–** ছেলেরা কোথায়। **জী কন**– কী বলেন। **ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে–** ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে আছে অর্থাৎ কাজ না করে আরাম আয়েশে আছে। **তয়**– তবে। **তানার**– তাঁর। **তানারে কন**– তাঁকে বলুন। **তাগো**– তাদের। **থিকা**– থেকে। **দুলামিঞা**– বোনের স্বামী, জামাই। **দূর থেকে যা হোনে তাতেই চলে**– দূর থেকে যা শোনে তা বিশ্বাস করে। **দেখন লাগবো**– দেখতে হবে। **পইড়া**– পড়ে। **পাঠামু**– পাঠাব। **পোলা পাইন**– ছেলেপিলে, সন্তান। **বইনে**– বোনে। **বইলাই**– বলেই। **বুঝলান নি–** বুঝলেন কি? **বিটি–** বেটি, কন্যা। **মওত**– মৃত্যু। **যানি**– যেন। **লগে**– সঙ্গে। **শেষকাটালে**– শেষ সময়ে। **সট্‌কাইছে**– পালিয়ে গেছে। **হুদাহুদি**– শুধু শুধু। **হুনে**– শোনে। **হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী**– সে ভেবেছে মিথ্যে পানি এনে লাভ কী? **হেই পীরের কাছে আমি যামু না**– সেই পীরের কাছে আমি যাব না। **হেই কথা আমিও ভাবতাছি**– সে কথা আমিও ভাবছি।

বাগধারা

এক হাত দেখে নেওয়া–	প্রতিশোধ নেওয়া।	**পরগাছা–**	যে অন্যের খেয়ে বাঁচে
ওস্তাদের মার–	কুশলী ব্যক্তির নৈপুণ্য	**পালাই-পালাই ভাব–**	পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে
কথা পাড়া–	বিষয় উত্থাপন করা	**ফাড়া কাটা–**	বিপদ দূর হওয়া
কাক পক্ষীও খবর না পায়–	কেউ যাতে টের না পায়, সকলের অজ্ঞাতে	**বংশে বাতি জ্বালা–**	বংশ রক্ষা করা
কেতা দুরস্ত–	ফিটফাট	**বুক বেঁধে থাকা–**	ধৈর্য ধরে থাকা
খাপে খাপে মেলা–	সম্পূর্ণ রূপে মিলে যাওয়া	**বুদ্ধি গজানো–**	বুদ্ধির জন্ম
গলা শুকানো–	ভীত হওয়া	**বুকের রক্ত শীতল হওয়া–**	অতিরিক্ত ভয় পাওয়া
গা ঢাকা দেয়া–	লুকিয়ে থাকা	**ভর দুপুরে–**	ঠিক দুপুর বেলায়
ঘুণাক্ষরে–	আভাসে ইঙ্গিতে	**মন গলে পানি হওয়া–**	দয়ালু হওয়া
ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া–	ওপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা।	**মরিয়া হয়ে ওঠা–**	বেপরোয়া ভাব
জোয়ার লাগা ভরা গাঙ	পরিপূর্ণ যৌবন	**মুখে ছায়া পড়া–**	বিরক্তিতে কিংবা চিন্তায় মুখ অপ্রসন্ন হওয়া
ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া–	রাগ বা উত্তেজনা কমানো	**রঙ ফলানোর**	বাড়িয়ে বলা
থ হওয়া–	হতবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়া	**লজ্জা-শরমের বালাই–**	লজ্জার বোধ।
ধামাচাপা দিয়ে রাখা–	গোপন করা	**শূন্য কোল–**	সন্তানহীন

সারসংক্ষেপ

মজিদের মনের ভেতরে ভয় থাকলেও আওয়ালপুরের বুড়ো পীর সাহেবের কাছ থেকে পাল্টা হামলা হয়নি। খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তান আমেনা বিবি সন্তান লাভের কামনায় সে স্বামীকে অনুরোধ করে ঐ পীরের কাছ থেকে পানি পড়া আনতে। মজিদ এর আগে পীর সাহেবের কাছে যেতে সবাইকে মানা করে দিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর খাতিরে ব্যাপারী তার সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে আওয়ালপুর থেকে রাতে গোপনে পীরের পানিপড়া আনতে বলে। ধলা মিয়া মজিদের কাছে গিয়ে সব কথা বলে দেয়। মজিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায়। কথায় কথায় ব্যাপারী এটি বুঝতে পারে যে পানিপড়া আনার ঘটনা মজিদ জেনে গেছে। মেয়ে মানুষের মন বোঝানোর জন্য যে একাজ করেছে এমন একটা ধারণা দিতে ব্যাপারী চেষ্টা করে। মজিদের দুঃখ আমেনা বিবি তার চেয়ে ঠক-পীরকে বেশি বিশ্বাস করল। মজিদ ব্যাপারীকে

এক অদ্ভুত কথা শোনায়। বলে, আমেনা বিবির পেটে বেড়ি পড়েছে, সেজন্য তার সন্তান হচ্ছে না। কথাটি সে এমনভাবে বলে যাতে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। মজিদ উদ্বিগ্ন ব্যাপারীকে বেড়ি খোলার উপায়ও জানিয়ে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. ধলা মিয়া কোন ধরনের মানুষ?

ক. ধূর্ত　　খ. বোকা
গ. চালাক　　ঘ. জ্ঞানী

২২. আমেনা বিবির 'পড়া পানি' আনাটাকে মজিদ কী মনে করেছে?

ক. ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া　　খ. ঘোড়ায় চড়ে ঘাস খাওয়া
গ. মাছ শিকার করে ঘাস খাওয়া　　ঘ. মাছ ছেড়ে ঘাস খাওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গফুর শ্যামপুরে একটি মাজারের সেবায়েত। ঘরে তার সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। তবুও মাজারে আগত সুন্দরী রমণী দেখলে তার জিভে আদিম কামনা সাপের মত লকলক করে।

২৩. উদ্দীপকের গফুরের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. মজিদ　　খ. আক্কাস
গ. খালেক ব্যাপারি　　ঘ. মোদাব্বের মিঞা

২৪. উভয়ের সাদৃশ্যের পশ্চাতে যে কারণ নিহিত রয়েছে–

i. দুজনেই বিবাহিত
ii. নারী আসক্তি প্রবল
iii. ভালো মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i ও ii

পাঠ-৭

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মাজারে যাওয়ার জন্য আমেনা বিবির প্রস্তুতি ও তার মনোভাবের কথা জানতে পারবেন।
- মাজারে পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা বিবৃত করতে পারবেন।
- আমেনা বিবিকে খালেক ব্যাপারীর তালাক দেয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানি পড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিলো; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হলো। আস্তে-আস্তে একটা ভয়ও এলো মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চৌদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউ-এর তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিলো আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতোমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবি সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহীমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়– পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহীমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

–বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

–আমি দেই নাই।

–দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। –তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চৌদ্দ প্যাঁচ?

রহীমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

–তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহীমা মুশকিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়। তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহীমা আস্তে বলে,

–তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহীমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

–পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

–না। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্তসীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দুজন বেহারা পাল্কি এনে লাগালো অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারী হাঁকে, –কই, তৈয়ার হইছেননি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুষ ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

–ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি-গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে– ক-ঘণ্টায় যে ভয় দীর্ঘ রোগভোগ করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারলো সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ-প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে-শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো-বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমতা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মস্করা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিলো। বেহারারা পাল্কিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখলো।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, –নামবো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

–তাঁনারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তাঁনার ওজু আছেনি।

ব্যাপারী ছুটে যায় পাল্কির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,

–আছেনি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

–তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্মতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে। পাল্কির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্মতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পাল্কি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়-চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নোতুন বউ এর মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মান নোতুন বউ এর আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোয় সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহা-আকাশের মতই সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহা-আকাশের মতই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

–তাঁনারে বইবার কন

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

–বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিলো। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়া হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পাল্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিলো, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা– দেখে স্নেহ-মমতা উঠে না এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেতো। এবং যেতো সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণু ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে– যেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধ্বসে আছে,

বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

–পানিটা দেন।

ব্যাপারীও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির পান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে, –তাঁনারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

–আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তাঁনারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চমকে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা– বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিলো। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করলো, হয়তো-বা তাকে আলিঝালি দেখলেও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখলো না, জানলো না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানলো না-মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠতো।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে, –কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্চ্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহীমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসতো যদি না সঙ্গে থাকতো ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিলো। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিলো। রহীমা মনে-মনে স্থির করেছিলো, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যাই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহীমা যে-দৃশ্য দেখলো তারপর গল্প গুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির

মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পাঁজাকোল করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলো।

মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইলো, দুজনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দরঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেলো। দু-জনেই এক এক করে হুকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানি পড়া খাবার সখ হয়েছিলো সে-আমেনা বিবির ওপর– আকার ইঙ্গিতে বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও– মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিলো। তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিলো। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেলো, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখালো, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

–দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, –রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানি পড়াডা দিলাম– তা কিসের জন্য? শরীলে তাকত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

–তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

–আপনে তাঁনার স্বামী– ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত– টাটকা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথাহত প্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

–কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোনো কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

–না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তাঁনারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তের বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জোৎস্নার পানে বেদনাভারি চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

–কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছেনি?

ব্যাপারী ভারি গলায় আস্তে বলে,

–আছে?

– হে তহুর বাপের কথা মাইন্ষেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

–ক্যান?

–কারণ হেই ব্যাপার খিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইলো এই : পাক-দিল আর গুণাগার দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপির ভাল মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

–আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

–সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তাঁনারে তালাক দেন।

এ সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়ালো। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

–কী গো বিটি?

–তাঁনার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

–মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পাল্কিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেলো। তার মনের কথা জানা গেলো না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য– আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখলো না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেতো, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুকার নীলাভ ধোঁয়া অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয়

একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আরেকবার মনে হয়, সে শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিলো না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিলো না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিলো না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমনকাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রঙ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পাল্কিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাল্কির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসতো। সেটা হলো থোতামুখো তালগাছটা। বহু দিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পাল্কির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝতো যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিলো নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অতুজ্জ্বল– তীক্ষ্ণ ও অতি উজ্জ্বল। **অনলকণা**– আগুনের স্ফুলিঙ্গ। **অন্যমনস্কভাবে**– আনমনাভঙ্গিতে। **অবিশ্রান্ত**– বিশ্রাম না নিয়ে। **অন্তহীন**– শেষ নাই যার। **অন্তর দৃষ্টি–** মনের চোখ। **অন্দর ঘর**– ভিতর বাড়ি। **অনিশ্চয়তা**– সংশয়, সন্দেহ। **অবসান–** শেষ। **আচম্বিতে**– হঠাৎ, আচমকা। **আদিম**– অতি পুরাতন। **অপ্রত্যাশিতভাবে**– আকস্মিকভাবে। **অবজ্ঞা**– অসম্মান, ঘৃণা। **আপত্তিকর**– দোষের। **আবছায়া**– আলো আঁধার। **আবছা–** অস্পষ্ট। **আবির্ভাব**– আগমন। **আলিঝালি**– অস্পষ্ট, এলোমেলো। **আস্ফালন**– বাহাদুরি। **আড়চোখে**– চোরা দৃষ্টিতে। **আড়ালে-আবডালে**– অজান্তে, গোপনে। **ঈষৎ**– সামান্য। **উপক্রম**– অবস্থা। **ওজু**– নামাজ ও ধর্মীয় কাজ করার জন্য বিশেষ রীতিতে হাত পা ধোওয়া। **কারুকার্য–** সূক্ষ্ম কাজ। **কান দুটোতে রঙ ধরে**– লজ্জা হয়। **কানিয়ে চেয়ে**– আড়াচোখে দেখে। **কাহিল**– দুর্বল। **কুপি**– বাতি। **কুয়াশাচ্ছন্ন**– কুয়াশায় ঘেরা। **কোটরাগত**– গর্তে ঢোকানো। **খসে আসবে**– আলাদা হয়ে আসবে। **খিলি–** ভাঁজ করা সাজানো পান। **গলিয়ে ঢোকা**– কোন একটি পথে ঢুকে যাওয়া। **গর্হিত**– অন্যায়। **গাছগাছলা–** গাছ ও ঝোপঝাপ। **গুটি গুটি পায়ে হাঁটা–** খুব আস্তে আস্তে সাবধানে হাঁটা। **গেলাফ–** কাপড়ের আবরণ। **গোলযোগ**– গণ্ডগোল, ঝামেলা। **ঘরকন্না**– সংসার, ঘরের কাজ। **ঘূর্ণমান**– যা ঘুরছে। **চক্কর খায়**– চারদিকে ঘোরে। **চক্রান্ত–** দুষ্ট বুদ্ধি, ষড়যন্ত্র। **চিকন–** সূক্ষ্ম, মিহি। **চুকে গেলে–** শেষ হলে। **চোখে ধোঁয়া ভাসে**– চোখ ঝাপসা দেখে। **ছোবল**– সাপের কামড়। **জালি**– পোকায় কাটা ছিদ্র। **জীবনের অলি-গলি**– জীবনের নানা পথ। **জৌলুষ**– উজ্জ্বলতা। **ঝঙ্কার–** বাদ্যযন্ত্রের কিংবা চুড়ি জাতীয় অলঙ্কারের আওয়াজ। **ঝড়ে-পানিতে**– সকল আঘাতে। **ঝালর**– চাদর জাতীয় কাপড়ের ঝুলে থাকা অংশ এবং এটি কাজ করা থাকে। **টকটকে**– উজ্জ্বল। **টাট্‌কা**– তাজা। **টাল খেয়ে**– ঘুরে। **ঠক্কর**– বাধা। **ঠাট**– গর্ব, আড়ম্বর। **তাকত**– শক্তি। **তাগিদ**– প্রেরণা, আশা। **তাছির–** প্রভাব। **তালাব**– পুকুর। **তেরছাভাবে**– বাঁকাভাবে। **দয়া উথলে ওঠা**– বেশি করে দয়া হওয়া। **দাউ-দাউ**– বেশি জোরে আগুন জ্বলার ভাব। **দু'কদমের পথ–** অল্প দূরত্বের পথ। **দু-দণ্ড–** সামান্য সময়। **দুনিয়ার ছায়া নেই**–মৃতের মতো। **দুরূহ**– কঠিন। **দুষ্ট আত্মা**– ভূত প্রেত। **দেমাকি**– দেমাক বা গর্ব আছে যার। **ধমনি**– শিরা। **ধ্বসে আছে**– ভেঙে পড়ে গেছে।

ধাপে ধাপে– বিভিন্ন সময়ে। **নাইয়র**– বাড়ি। **নাক বরাবর**– সোজা, সম্মুখ। **নিশানা**– চিহ্ন। **নিঃসৃত**– বের হওয়া। **নীলাভ**– নীল রঙের। **পতিত**– পাপী, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত। **প্রখর দুনিয়ার ছায়া নেই**–মৃতের মতো। **প্রতি বৎসরের শূন্যতা**– প্রতি বৎসর সন্তান না হওয়ার অভাব। **প্রশমিত**– থেমে যাওয়া, বন্ধ। **পাড়**– শাড়ির প্রান্ত। **পালক স্পর্শ**– অতি হালকা স্পর্শ। **পাঁজা কোল**– দুহাত বাড়িয়ে টেনে কোলে নেয়া। **ফলা**– অস্ত্রের তীক্ষ্ণ মুখ। **ফস্কে গেল**– হাতছাড়া হল। **ফ্যাকাশে**– ম্লান, মলিন। **ফুটফুটে**– সুশ্রী, সুন্দর। **বরঞ্চ**– বরং। **বাসনা**– ইচ্ছা। **বিক্ষিপ্ত**– অস্থির। **বিচ্ছুরিত**– ছড়িয়ে পড়া। **বিন্দুমাত্র**– সামান্য। **বিস্তর**– অনেক। **বিহিত করা**– সমাধান করা। **বিবর্জিত**– সম্পর্ণরূপে বাদ। **বিদ্বেষ**– ঘৃণা। **বুটিদার**– বুটিওয়ালা, যে কাপড়ে সূচের তৈরি ফুল তোলা হয়। **বেদনাভারি**– অতি ব্যথিত। **বেহারা**– পাল্কি বাহক। **বেহুদাপনা**– অকাজ। **বেলা শেষের ম্লান আলো**– বিকেল বেলার নিস্তেজ আলো। **ভীত বিহ্বেল**– ভয়ে কাতর। **মসৃণ**– তেলতেলে। **মাদুর**– পাটি। **মাল মশলা**– উপকরণ। **ম্রিয়মান**– মরে যাচ্ছে এমন। **মিহি**– চিকন, সূক্ষ্ম। **মুষড়ে যাওয়া**– ভয় পাওয়া। **মেদবহুল**– চর্বিওয়ালা। **ভুখা**– ক্ষুধার্ত। **মুখে চুন দেয়া**– গর্ব খর্ব করা। **মায়া-মহব্বত**– প্রেম, ভালোবাসা। **যন্ত্রচালিত**– যন্ত্রের মত চলা। **রক্তাভা**– লালচে রঙ। **রেহেল**– কোরান শরীফ রাখার জন্য কাঠের কাঠামো। **রোশনাই**– আলো, আলোর উজ্জ্বলতা। **লম্বা কোর্তা**– আল খাল্লা জাতীয় পোশাক। **লহরি**– ঢেউ। **লালাসিক্ত**– পোকার শরীর থেকে নির্গত আঠাযুক্ত। **লিকলিক করা**– চিকন ও লম্বা জিনিসের নড়ন। **শানিত**– তীক্ষ্ণ। **শাস্তি বিধান**– শাস্তির ব্যবস্থা। **শিখা**– আগুনের শিষ। **সখ**– ইচ্ছা। **সংকীর্ণতায়**– অপরিসর জায়গায়। **সংযত**– দমন। **সঞ্চার**– আবির্ভাব। **স্তব্ধতা**– শব্দহীনতার অবস্থা। **সর্বতোভাবে**– সব দিক থেকে। **স্বল্পভাষী**– অল্প কথা বলে যে। **সমতা**– মিল। **সালু কাপড়**– লাল কাপড়। **স্ফীত উদর সম্বলিত**– মোটা পেট যুক্ত। **সূচের তীক্ষ্মতায়**– সূচের মতো তীক্ষ্ণ রূপে। **হকচকিয়ে ওঠা**– হতভম্ব হওয়া, বিস্মিত হওয়া। **হত প্রশ্নের নিশ্চুপতা**– প্রশ্ন করে লাভ নেই, সেজন্য চুপ হয়ে থাকা। **হাসিল**– অর্জন। **হুঙ্কার**– সাবধান বাণী। **হুস**– জ্ঞান। **হেস্ত-নেস্ত**– মীমাংসা, নিস্পত্তি।

বিশিষ্টার্থক ব্যবহার

অক্ষরে অক্ষরে– পুরোপুরি।
এক ঢিলের পথ– অতি কাছে।
চোখ অন্ধকার হওয়া– চোখে কিছু না দেখা।
বাতাসে কথা শুরু করে– গোপন কথা অতি দ্রুত প্রকাশিত হয়।
পা চলে না– হাঁটার শক্তি নেই।
ফাঁসীর আসামী– কঠোর শাস্তি যার জন্য বরাদ্দ।
ভেঙে যাওয়া– শক্তিহীন হওয়া।
মুখ শুকিয়ে ওঠা– মুখের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়া।
সুখ দুঃখের কথা– সংসারের কথা।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

আপনেও– আপনিও। **এমন তাছির হেই পানি পড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে**– সেই পানিপড়ার এমন প্রভাব যে, পেটে গেলে এক মাসের ক্ষুধার্ত মানুষও সঙ্গে সঙ্গে সতেজ হয়ে ওঠে। **এহন**– এখন। **এহন পাক দেওন লাগব**– এখন ঘুরতে হবে তানারে বইবার কন– তাঁকে বসতে বলুন। **কওন**– বলা। **কিছু কমু না**– কিছু বলব না। তয় কেন তানি অজ্ঞান হইছেন– তাহলে কেন তিনি অজ্ঞান হয়েছেন? **তয় নামেন**– তাহলে নামুন। **তহুর বাপ**– তাহেরের বাপ, হাসুনির মায়ের বাপ। **তানারে উঠবার কন**– তাঁকে উঠতে বলুন। **তানার হুস হইছে**– তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। **তানি**– তিনি। **তৈয়ার হইছেন নি**– তৈরি হয়েছেন কী? **দিছেন**– দিয়েছেন। **দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি**– সারাদিন রোজা রাখায় তিনি বড় দুর্বল হয়েছিলেন। **দিবার চায়**– দিতে চায়। **নামাইয়া**– নামিয়ে। **পড়তাছি**– পড়ছি। **বইন**– বোন। **বহেন**– বসুন। **বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন**– বাড়িতে যেতে চাইছেন। **ভুলবার পারি নাই**– ভুলতে পারিনি। **মাইন্‌ষেরা**– মানুষেরা। **যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে**– যা পড়েছে পুকুরের মধ্যেই পড়েছে। **রাখলে**– রাখার জন্য। **শরীল**– শরীর। **শরীলে তাকত হইবার জন্য না?**– শরীরে শক্তি হওয়ার জন্য নয়? **শাস্তি পাইল হেই**– শাস্তি পেল সেই। **সময় হইছে**– সময় হয়েছে। **হে তহুর বাপের কথা ভুইলা গেছে**– সেই তাহেরের বাপের কথা মানুষেরা ভুলে গেছে।

সারসংক্ষেপ

শুক্রবারে আমেনা বিবি মজিদের নির্দেশ মতো রোজা রাখে, সারাক্ষণ কোরান পড়ে। দুপুরে মজিদের স্ত্রী রহীমা এসে আমেনা বিবিকে পেটে মাখার জন্য পানি পড়া দিয়ে যায়। সন্ধ্যার একটু আগে আমেনা বিবির জন্য পালকি আসে। আমেনা বিবির মাজারে যেতে অনিচ্ছা। তার ভয়, মাজারের চারধারে ঘুরেও যদি তার সন্তান না হয়। পালকি থেকে নামার সময় আমেনা বিবির সুন্দর পা দেখে মজিদের মনে কামভাব জাগে। তার পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি মাজারের চারদিকে পাক দিতে শুরু করে। তৃতীয় বার পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবি চোখে অন্ধকার দেখে এবং মূর্ছা যায়। মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বোঝাতে চায় যে, রোজা রাখার জন্য দুর্বল হয়ে আমেনা বিবি মূর্ছা যায়নি; অন্য কারণ আছে। পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি যখন সাত পাক দিতে পারল না তখন আর সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবি অপবিত্র। মজিদ ব্যাপারীকে সরাসরি বলে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। ব্যাপারী অনেক চিন্তা করার পরেও মনে করে যে মজিদের কথাই ঠিক। এরপর ব্যাপারী আমেনা বিবিকে তালাক দেয়। বজ্রাহত মন নিয়ে আমেনা বিবি বাপের বাড়িতে চলে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. রহীমার পেটে কয়টি প্যাঁচ?

ক. ১৪টি
খ. ১৫টি
গ. ১৬টি
ঘ. ১৭টি

২৬. আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া হয় যে কারণে–

ক. সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা
খ. মজিদের অহমিকায় ঘা পড়ায়
গ. খালেক ব্যাপারির মানসিক যন্ত্রণা
ঘ. আমেনা বেগমের চারিত্রিক স্খলন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

এক আজব নগর অচিনপুর। এখানে এখনো মধ্যযুগের আবহ বিরাজ করে। বাচ্চারা স্কুলে যায় না। যায় মন্দির বা টোলে। সমাজ চলে পুরোহিতের কথা অনুযায়ী। তার সিদ্ধান্তই সেখানে আইন। জলপড়া, দেবতার চরণামৃত ইত্যাদি সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা।

২৭. উদ্দীপকের অচিনপুরের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন গ্রামের মিল রয়েছে?

ক. মনোহরপুর
খ. মতিগঞ্জ
গ. মধুপুর
ঘ. মহব্বতনগর

২৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে–

i. শিক্ষায়
ii. চিকিৎসায়
iii. ধর্মচিন্তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- আক্কাসের একটি স্কুল করার প্রচেষ্টা ও তা ভণ্ডুল হওয়ার কাহিনি লিখতে পারবেন।
- গ্রামে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- মজিদের বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে ঐখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারে গাত্রাবরণ বদলানো হয় এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তা আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরানো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রঙ চটে যায়, বা সালু কাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া– তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারি হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহীমা বিড়বিড় করে বলে, –তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারি। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিলো বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিলো। ভেবেছিলো, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এ জন্য আরো বেশি বোধ করলো যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিলো না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা

একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখলো না। ভাবলো, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কী দু-দুটো মক্তব বসানো হয়নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো। ইস্কুলের জন্য দস্তুরমত চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগলো, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কোনোপ্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করলো,

–কী হুনি ব্যাপারী মিঞা?

ব্যাপারী বলে, কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এলো।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলো। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে– এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এলো। তারপর মুর্হূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রগ। ঠাস করে চড় মারা ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলো,

–তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলো, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। ইস্কুল হবে কী হবে না– সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাটা, কারো স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারো-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেতো। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

–তুমি না মুসলমানের ছেলে– দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছিলো এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

–আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ– তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,

–হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

–আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

–তা এ বদ মতলব কেন হইল?

–বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুফির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার– এ রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইলো তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে–।

সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকতো আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচতো; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, –মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইতো, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরতো– আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিলো, কিন্তু মজিদের একশ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, –ভাইসকল! পোলা মাইন্ষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে– তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে– এ আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নোতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেলো। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে,

–বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন!

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন– আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

–তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

–চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারো না কারো যেন যৎকিঞ্চিত হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এ ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর

খায়েশখোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটলো। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যায়ের বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

–ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে– এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক– একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিলো ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিলো এ মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিলো ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে, এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিলো তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দরুদ পড়ছিলো মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নাবিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালু কাপড়টা এক কোণে উলটে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় কবরের সে অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরটা, কিন্তু সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে

উঠেছিলো, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গবোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন– যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহীমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহীমা কোনো প্রশ্ন করে না। কিন্তু মনে-মনে ভাবে।

এক সময়ে মজিদই বলে,

–বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকতো!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহীমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে, –আমার বড় সখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

–নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া-দেয়। মহড়া-দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহীমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

–আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিতো!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিলো। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিলো যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরিফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান-পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে– তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহীমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিলো। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহীমাকে বলে,

–বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্যে রহীমা পা-টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

–বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথি আনুম? সাথি মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহীমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহীমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

–কী কও?

–আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহীমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এ মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্তবড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অতিক্রান্ত– ফেলে আসা। **অপলাপ**– মিথ্যে কথা। **অন্তর**– পর। **অন্তসারশূন্যতা–** ভিতরটা শূন্য এমন ভাব। **আওলাঘর–** বসার ঘর। **আর্জি**– নিবেদন, প্রার্থনা। **আস্ত**– পুরো। **আদি অন্তহীন**– যার শুরু নাই শেষও নাই, বিশাল, সীমাহীন। **অনাবৃত**– আঢাকা, খোলা। **আফসোস**– অনুতাপ। **আড়ত**– ব্যবসা-কেন্দ্র, কেনা-বেচার জায়গা। **উচ্ছ্বসিত**– বেশি আবেগপূর্ণ। **উপভোগ**– তৃপ্তির সঙ্গে যাপন। **উপযুক্ততা**– যোগ্যতা। **ওক্ত**– নামাজের সময়। **কষ্টি পাথর**– সোনা ইত্যাদি যাচাই করার বিশেষ পাথর। **ক্ষান্ত**– শেষ। **ক্ষীণ**– অল্প, মৃদু। **কানাঘুষা**– কানে কানে কথা চালাচালি। **খামখেয়ালী–** খেয়াল খুশি মতো যে চলে। **খায়েশ-খোয়াব**– ইচ্ছা ও স্বপ্ন। **গদগদ–** অতিরিক্ত খুশি। **গতর**– শরীর। **গর্হিত**– খারাপ। **গাত্রাবরণ**– গিলাফ। **গুম্বুজ**– গম্বুজ, মসজিদ ইত্যাদির ওপরে গোল চূড়া।**চমৎকৃত**– অবাক। **চড়িয়ে**– উপড়ে তুলে।**চাকচিক্য**– উজ্জ্বলতা। **চাষাভুষা**– চাষী জাতীয় সাধারণ লোক। **চিরশায়িত**– চিরকাল শুয়ে থাকা মৃত। **ছাটা–** কেটে ছোট করা। **জমজমাট**– সরগরম। **জোতজমি–** সম্পত্তি। **জোশ**– উত্তেজনা। **ঝকঝকে রোদভাসা**– রোদে উজ্জ্বল। **ঠক্কর**– ধাক্কা, আঘাত। **তদারক**– দেখাশোনা। **নিত্যকার**– প্রতি দিনের। **দমকা**– হঠাৎ জোরে আসা। **দররা**– চাবুকের আঘাত। **দরিয়া–** নদী। **দুস্থ–** দীন, দুঃখী। **নিষ্ফলতা–** ব্যর্থতা। **নিছক**– খাঁটি। **নিঃসঙ্গ**– একাকী। **নিরাকপড়া**– একটুও হাওয়া নেই এমন। **পরমাত্মীয়**– অতি নিকটজন। **পলক–** নিমেষ। **পরিত্রাণ**– উদ্ধার। **প্রত্যাবর্তন–** ফিরে আসা। **পাগলা হাওয়া**– এলোমেলো হাওয়া। **পাত**– লোহা বা তামার পাতলা করা অংশ। **পাদদেশে–** নিচে। **প্রার্থী–** ইচ্ছুক ব্যক্তি। **পিচ্ছিল**– পিছলা। **পুষ্যি**– পোষ্য, দত্তক। **বদ খেয়াল**– দুষ্ট ইচ্ছা। **বদ মতলব**– দুষ্ট বুদ্ধি। **বরঞ্চ**– বরং। **বড়গা**– বরগা, ছাদের ভার, রক্ষার জন্য ব্যবহৃত কাঠ অথবা লোহা। **ব্যথাবিদীর্ণ**– ব্যথায় ছিড়ে গিয়েছে এমন। **বাজা**– বন্ধ্যা, যে নারীর সন্তান হয় না। **বাঞ্ছনীয়**– যে রকম ইচ্ছা করা হয়েছে, কাম্য। **বিবর্ণ–** রং ওঠা। **বিসদৃশ**– অন্য রকম। **বৈঠক–** সভা। **বৃষ্টির পানি সিঞ্চিত**– বৃষ্টির পানিতে ভেজা। **ভারি**– দুঃখিত। **মক্তব**– মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। **মথিত**– আন্দোলিত। **মহড়া**– প্রস্তুতি। **মর্জি–** ইচ্ছা। **মঞ্জুর–** গৃহীত। **মুরুব্বি**– গুরুজন। **মুসল্লি**– যারা নামাজ পড়ে, নামাজী। **যপতপ**– মন্ত্রপাঠ। **যৎকিঞ্চিত**– সামান্য। **যশমান**– সুনাম ও সম্মান। **রকম-সকম**– ভাবভঙ্গি। **রুদ্ধ–** বন্ধ। **রেশ**– অনুরণ। **রোশনাই**– আলোকিত। **লাট-বেলাট**– ক্ষমতাশালী। **শাস্তিবিধান**– শাস্তির ব্যবস্থা। **শিকড়গাড়া**– শিকড় মাটিতে অনেকটা ঢুকে যাওয়াতে গাছের শক্ত অবস্থান। **শিলাবৃষ্টি**– ঝড়ো বৃষ্টির সঙ্গে বরফ খণ্ড পড়া। **শিরালি**– শিলাবৃষ্টির ভয় কাটানোর জন্য যারা মন্ত্র পড়ে। **শিরনি**– পুণ্য লাভের জন্য মসজিদে বা পীরের বাড়িতে দেয়া পায়েস জাতীয় খাদ্য। **সকাতর**– কাতরতাসহ। **সমস্বরে–** এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে। **সূত্র–** সম্পর্ক। **সুদৃশ্য–** দেখতে সুন্দর। **সম্মান-প্রতিপত্তি–** মর্যাদা ও ক্ষমতা। **সচ্ছলতা**– প্রাচুর্য। **সমৃদ্ধি**– টাকা পয়সা ও সম্পত্তির উন্নতি। **সৌখিনতা**– সখ। **স্বল্পভাষিণী**– যে স্ত্রীলোক কম কথা বলে। **হিড়িক–** হুজুগ। **হুড়কা–** দরজার খিল। **হেদায়ত–** সংশোধন।

বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ :

অন্যের মাথা গরম করা– অন্যকে রাগিয়ে দেয়া। **অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে**– অনেকেই কিনতে চায়। **ইস্কুল বসানো**– বিদ্যালয় তৈরি করা। **উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাড়ের মধ্যে**– সব উজ্জ্বলতার মধ্যে। **ওঠে পড়ে লেগে গেলো**– তৎপর হল। **কথাটা ঢাকা পড়ে গেছে**– কথাটি নিয়ে আর কেউ আলোচনা করছে না। **কয়েকজন রুপালি চাকচিক্য**– উচ্চ গিলাফে ঢাকা মাজার **কালো করে রেখেছে কেমন**– মনটা বিষাদে ভরে গেছে। **কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব**– কাউকে তোয়াক্কা করছে না এমন ভাব। **খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রগ**– রেগে বা উত্তেজিত হয়ে উঠল। **গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে**– শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করতে পারে। **গা ঢিলা করে**– স্বস্তি পায়। **জীবন আর কদিন**– জীবন শেষ হয়ে এসেছে। **ডাল পালা শাখা প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে**– কথাটা সব দিকে ছড়াচ্ছে। **তসবি টিপতে পারবে**– ধর্মকর্ম করতে পারবে। **দুনিয়ার পাট গুটানো**– পৃথিবীর কাজ কর্ম শেষ করে আনা। **নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা**– নিজের ভাবনায় ডুবে থাকার কারণে উদাসীন ভাব। **বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে**– বুকের ভিতরে দুঃখ জাগে। **বাড়াবাড়ির সীমা**– অতিরিক্ত কিছু করার সীমা। **মন অন্ধকার হওয়া**– মনে দুঃখ আসা। **মাথাটা একটু গরম ধরেছে**– মাথা বিগড়ে গেছে। **মুখ খুলেছে**– কথা বলতে শুরু করেছে। **যুক্তি তর্কের ধার ধারে না**– যুক্তি মানে না। **যে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো**– চারদিকে অনবরত যেতে লাগল। **হাওয়ায় কদিন ধরে একটা কথা ভাসে**– প্রধান আলোচ্য বিষয়।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য :

আইজকাইল ইংরাজি না পড়েল চলব ক্যামনে– আজ কাল ইংরেজি না পড়েল চলবে কীভাবে। **আপনি যা হুনছেন–** আপনি যা শুনেছেন। **আপনে যেমুন বোঝেন**– আপনি যেমন বোঝেন। **আমাগো ভালে ধান হইছে–** আমাদের ভালো ধান হয়েছে। **আমাগো**

মনের কথাডাই কইছেন– আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন। **আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত**– আমাদের যদি ছেলে-পিলে থাকত। **আমি কত কই ছ্যামড়া দাড়ি রাখ তা হের কান দিয়া যায় না কথাটা–** আমি কত বলি, ছেলে দাড়ি রাখ তা ওর কান দিয়ে যায় না কথাটা। **কথাডা ঠিকই–** কথাটা ঠিকই। **কী কও**– কি বল। **গিরাম–** গ্রাম। **চুপ কর ছ্যামড়া–** চুপ কর ছেলে। **তোমার একটা সাথী আনুম**– তোমার একটি সঙ্গী আনব। **পোলা**– ছেলে। **পোলা মাইনষের–** ছেলে মানুষের। **বেত্তমিজের মতো কথা কইস না–** অভদ্রের মতো কথা বলিস না। **ফেলাইয়া রাখা ঠিক না–** ফেলে রাখা ঠিক নয়।

সারসংক্ষেপ

রহীমা আমেনা বিবির কথা ভুলতে পারে না। খোদা দয়ালু হয়েও এত কঠিন কেন? রহীমার কথায় মজিদ চমকে ওঠে। এদিকে মোদাব্বের মিঞার ইংরেজি পড়া ছেলে আক্কাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তোলে ও সরকারের কাছে আবেদন দেয়। গ্রামের মুরুব্বিরা এটা পছন্দ কওে না, মজিদ তো নয়ই। মজিদ আক্কাসকে কাবু করার পথ খুঁজতে লাগে। স্কুলের ব্যাপারে যে বৈঠক বসে তাতে মজিদ হঠাৎ আক্কাসকে জিজ্ঞেস করে বসল তার দাড়ি কই। আক্কাস স্কুল সম্পর্কে কথা বলতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু এ রকম উদ্ভট আক্রমণে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মজিদের প্রভাবে মহব্বতনগরের সবাই দাড়ি রাখতে শুরু করেছে, শুধু ব্যতিক্রম আক্কাস। মজিদ সকলকে বুঝিয়ে দিল যে, স্কুল গড়ার চিন্তা আক্কাসের মনের একটি বদ খেয়াল মাত্র। এরপর মজিদ একটি নতুন প্রস্তাব দেয়, তা হলো মহব্বত নগর গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হলেও এখানে পাকা মসজিদ নেই। পাকা মসজিদ করার প্রস্তাবে সবাই প্রবল উৎসাহ বোধ করে। খালেক ব্যাপারী খরচের বারো আনা বহন করার আগ্রহ দেখায়। তবে মসজিদ নির্মাণে গ্রামের সকলেরই কিছু না কিছু অংশ থাকতেই হবে। এটি মজিদের ইচ্ছা। এভাবে আব্বাসের স্কুল গড়ার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। মোদাব্বের মিঞাই জানায় ছেলে যদি আর অগ্রসর হয় তাকে দু টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে। মজিদ একদিন দেখে মাজারের সালু কাপড়ের এক অংশ বাতাসে উল্টে আছে। কার কবর এটি? মজিদ জানে না। রাতে ঘুমাবার সময় মজিদ রহীমাকে বলে, যদি তাদের ছেলেপিলে থাকতো। পরদিন মজিদ রহীমাকে জানায়, সে রহীমার সাথী আনবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. 'চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না।'– উক্তিটি কার?

ক. ধলা মিঞার
খ. খালেক ব্যাপারির
গ. মোদাব্বের মিঞার
ঘ. তাহেরের পিতার

৩০. আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন?

ক. মজিদকে গ্রাম ছাড়া করতে
খ. সমাজ সেবা করতে
গ. গোঁড়ামি দূর করতে
ঘ. এলাকাবাসিকে শিক্ষিত করতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শ্রী সদানন্দ চক্রবর্তীকে গ্রামের অর্ধেক লোক 'সাদা দাদা', অর্ধেক লোক 'সাদা পাগলা' বলিয়া ডাকিত। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরেজি ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরেজি শিখিলে ধর্ম নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে-পড়িতে শিখান নাই।

৩১. উদ্দীপকের সদানন্দের পিতা 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. মোদাব্বের মিঞা
খ. ধলা মিঞা
গ. খালেক ব্যাপারি
ঘ. আওয়ালপুরের পীর

৩২. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ–

i. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা
ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি
iii. কূপমণ্ডুকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বিদ্রোহী জমিলার চরিত্রের একটি দিক বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাজারে জিকির অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথির হৈহুলস্থূল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিলো যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

–হে নামাজ জানেনি?

রহীমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

–জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহীমা সরাসরি উত্তর দেয়,

–পড়বো আর কি ধীরে-সুস্থে,

–তোমার হে মানসম্মান করেনি?

–করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে– এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিলো।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনে নি। রহীমা জোরে হাসে না। সালু আবৃত মাজারের আশে-পাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো। এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-বা কবে মজিদ এমন হাসি শুনেছে। জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবির সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্ন-সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির

লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

–কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

–মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহীমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলানি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহীমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহীমা বলে,

–জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনবো।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

–একটা মজার কথা মনে পড়লো বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহীমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

–কী কথা বইন?

–কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

–কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

–তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তাঁনারে দেখাইছিল।

–কারে দেখাইছিল?

–আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মস্করা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর– হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে– আর, এখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না। রহীমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত উঠে ভারি হয়ে থাকে। রহীমার অলক্ষে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তার পর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহীমা যেমন চমকে উঠেছিলো তেমনি চমকে উঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝেঁকে চোখ নাক মোছে।

রহীমা আস্তে বলে,

–কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহীমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহীমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিলো এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহীমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে– পূর্বাহ্নে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহীমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিলো। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেলো। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, –সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে। –ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রুহ-এর জন্য দোয়া করা, সে যেন বেহেস্তে স্থান পায়, তার গুণাহ যেন মাফ হয়ে যায়– তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুস নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরে আগে মজিদকে নিকটে কোনো একস্থানে যেতে হয়েছিলো, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশা নাই।

রহীমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহীমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

–ওইটার হইছে কী?

রহীমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

–মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

–কিন্তু ... ক্যান খারাপ করছে?

রহীমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে,

–ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ায় হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী– তবে না হয় বুঝতো মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢঙ? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে উঠে বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বলা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহীমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কুল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে– এ ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে-মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এ মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকি-ধিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনলো? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো– তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারি হয়ে এলো। তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেলো। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝলো না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসলো। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহীমা শোয়। সেখানেই রহীমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁট একটু নড়ে উঠলো– যেন মাই খেতে-খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিলো, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হলো সে-কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহীমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহীমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠে রহীমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

–জমিলা কই?

–ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এ নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দুরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে উঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

–ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছেনি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিলো, তবু টান হয়ে বসেছিলো আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহীমা পেছনে ছাপড়া দেয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিলো বলে সে-কথা সে জানে না।

–কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

–বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ঐসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহীমা নিরুত্তরে ভুষি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভুষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহীমা যখন ধীরে-ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহীমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এ সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহীমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনো দিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ– যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিলো বলে– সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুসঁতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহীমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহীমা বলে

–ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কী রাগ করা যায়?

–রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এ বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এ বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এর পর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

–ওর দিলে খোদার ভয় নেই। এটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান-পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে– দাঁতের আশে-পাশে ওপরে-নিচে। ঘষতে ঘষতে ঠোঁটের পাশের ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই– মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক-থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে তারপর বলে,

–রূপ দিয়া কী হইব? মাইন্ষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনের বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

–তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছো, তা কী শক্ত গুণার কাম জানো নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কী ডরাও না, দোজখের আঁগরে ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

–তাছাড়া, এ কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি। এ ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এখানে তাঁনার রূহ-এর দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মত। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহীমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল মশলা এলো ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকের এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগলো। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘৎ খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে-ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এ যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে নাবতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীর গতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে দুনে চলে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র আওযাজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু-হু-হু। আবার : হু হু হু। আবার–

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহীমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন এক সময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে। বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহীমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহীমাকে ডাকে,

–বুবু!

রহীমা শোনে কী শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারেনা। এবার ভেসে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদ্যুৎগতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে রুদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,

–বুবু!

এবার রহীমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে কেউ-বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে-ধীরে উঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়। এক সময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

–পাগলি ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এ বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষীপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে-একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

–ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, –আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহীমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহীমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

–হে কই?

রহীমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ উঠে চলে গেলো তারপর আর সে এদিকে আসেনি। আস্তে রহীমা বলে,

–বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

–ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহীমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিলো? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

–হে বাইরে গেছিলো?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

–হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহীমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবন্ত হুকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিলো মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহীমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বলা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহীমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে– বিবি, শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহীমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

–বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিছিলানি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহীমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয়,

–তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহীমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখদুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহীমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,

–কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট করে রহীমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহীমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে-পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহীমা বলে,

–কী কমু? মাইয়াডা যানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকল্পিত– স্থির। **অক্ষুণ্ন–** যা এখন ক্ষুণ্ন হয়নি বা ভাঙেনি। **অঘোরে**– বেহুঁশের মতো। **অচম্বিতে**– হঠাৎ। **অজস্র**– অনেক। **অটুট**– যা ভাঙে না, শক্ত। **অতলতা**– গভীরতা। **উত্তাল**– ভয়ঙ্কর। **অথই**– অতল, গভীর। **অধীরতা**– অস্থিরতা। **অনড়**– যা নড়ে না, শক্তি। **অন্তর খনন–** হৃদয়কে খোঁড়া। **অন্দরে বাইরে**– ঘরের ভিতরে ও বাইরে।**অনাবিল**– স্বচ্ছ, পরিষ্কার। **অনাড়ম্বর**– জাঁকজমকহীন। **অন্ন-সংস্থান–** খাবার জোটানো। **অপরাহ্ন**– বিকেল। **অপেক্ষাকৃত–** তুলনামূলকভাবে। **অবক্তব্য**– অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। **অবশ পদযুগল**– অসাড় দুই পা। **অবসাদ**– ক্লান্তি। **অবলম্বন**– নির্ভর। **অবসন্ন–** শ্রান্ত, ক্লান্ত। **অভুক্ত**– উপোস। **অলক্ষ্যে**– গোপনে, কেউ দেখে না এমন। **অশরীরী–** ভুতপ্রেত। **অস্তিত্ব–** সত্তা। **আগারবাতি**– ধুপকাঠি। **আগ্নেয়গিরি**– যে পাহাড় থেকে আগুন ও গলিত পদার্থ বের হয়। **আদ্যোপান্ত**– আগাগোড়া। **আধা পাগড়ি**– ছোট করে বানানো পাগড়ি, মাথা সম্পর্ণ ঢাকে না এতে।**আভাস**– পরিচয়, চিহ্ন। **আর্তনাদ**– কাতর চীৎকার। **আনুগত্য**– অধীনতা। **আলগোছে**– মৃদুভাবে। **আলিঝালি**– অস্পষ্ট, আবছা। **আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব–** পাবে কি পাবে না এ নিয়ে মানসিক সংকট। **আড়ষ্ট**– জড়োসড়ো, অবিশ্রান্ত। **ইঙ্গিত**– আভাস। **উত্তুঙ্গ**– অতি উঁচু। **একরত্তি**– এতটুকু। **এলেমদার**– জ্ঞানী, বিদ্বান। **কবজা**– ভয়ে দিশেহারা। **কড়া**– তীক্ষ্ণ । **কর্কশ**– কঠিন, অমিষ্ট।**কাটা চুলা**– ওঠোনে কিংবা খালি জায়গায় কেটে গর্ত করে যে চুলা তৈরি হয়; অস্থায়ী চুলা। **কালো হাওয়া**– অন্ধকারের হাওয়া। **কাড়ে**– চিড়ে। **কিছিম**– রকম। **কিড়মিড়**– উত্তেজনায় দাঁত কামড়ানোর ভাব। **ক্ষণকাল–** অল্পসময়। **ক্ষয়িষ্ণু**– ক্ষয়ে যাচ্ছে যা। **ক্ষীপ্রগতিতে**– অতি দ্রুত। **খড়ম**– কাঠের পাদুকা। **খ্যাংটা**– মেজাজ গরম, খিটখিটে। **খান খান**– টুকরো টুকরো।**খানিক**– অল্প। **খুঁটি**– বাঁশ বা কাঠের লম্বা থাম যার ওপর ঘর দাঁড়িয়ে থাকে, অবলম্বন। **গনগন**– আগুন জ্বলার শব্দ। **গর্জন**– রাগ প্রকাশের উচ্চ চীৎকার। **গুম**– গম্ভীরভাবে চুপ। **গুঁড়ি**– গাছের দেহ, কাণ্ড। **গোস্বা**– রাগ। **ঘোলাটে**– ভালো দেখা যায় না এমন। **চমকিত**– বিস্মিত। **চড়ানো–** রান্নার জন্য ডেকচি চুলোর উপরে দেয়া। **ছটা–** আলো, আভা। **ছত্রখান**– টুকরো টুকরো, লন্ডভণ্ড ধ্বংস। **ছলছল**– চোখের জল আসার ভাব। **ছারখার**– ধ্বংস। **ছাপড়া**– বাঁশ ছন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চাল। **ছিপি**– যা দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করা হয়। **ছুঁয়ে দিলে**– দোয়া পড়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে। **জাহেল**– মূর্খ, জ্ঞানহীন। **জিকির**– সমবেতভাবে উচ্চস্বরে বারবার আল্লাহর নাম নেওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান। **ঝলমল**– উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। **ঝাড়তে**– দোয়া পড়ে গা ফুঁ দিতে। **ঝুরে আসা চোখ–** কান্নায় কাতর চোখ। **ঝোঁক**– প্রবণতা। **টান**– শক্ত। **ডোম**– হিন্দু সমাজের একটি সম্প্রদায়। **ঠাটাপড়া**– বাজপড়া, বজ্রাহত। **ঠায়**– নড়াচড়া না করে। **ঢিলে তেতালা**– আস্তে আস্তে। **তলানি**– বিস্তৃতি। **তারস্বরে–** উঁচুস্বরে। **তিক্ততম**– সবচাইতে দুঃখজনক। **থাক**– সিঁড়ির অংশ, ধাপ। **দাওয়া**– বারান্দা। **দাহ্য-চেতনা–** পুড়বার ভাব। **দুনে**– দ্বিগুণ হয়ে। **দুলা**– বর। **দুষ্কর**– কষ্টসাধ্য। **ধারা**– প্রবাহ, গতি। **ধোয়া-পাকলা**– ধোয়ার কাজ। **নছিহত**– ধর্মীয় উপদেশ। **নাসারন্ধ্র**– নাকের ছিদ্র। **নিদারুণ**– খুব বেশি। **নিরবচ্ছিন্ন**– একটানা, অবিরাম। **নিরন্তর**– একটানা। **নিরুত্তরে**– উত্তর না দিয়ে। **নির্বিকারভাবে**– কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে। **নির্মম–** নিষ্ঠুর। **নুলা**– হাত বিকল হয়েছে এমন। **পশলা**– বর্ষণ, এখানে চোখের পানি পড়া। **পর্বতপ্রমাণ**– পাহাড়ের মতো উঁচু, বিরাট, বিশাল। **প্রতিচ্ছবি**– অনুরূপ ছবি। **পাট করা**– বিন্যস্ত। **পিড়ি**– কাঠের আসন। **পূর্ববৎ**– আগের মতো। **পেষনে**– চাপে। **ফালি**– টুকরো। **ফুঁসতে থাকে**– ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। **বর্তন**– বড় থালা। **বদদোয়া**– অভিশাপ। **বলক-ওঠা**– উথলান। **বলকে বলকে**– উথলে উথলে। **বালা**– বিপদ আপদ, রোগ। **বিঘৎ খানেক লেজ**– পাগড়ির ছোট ঝোলানো অংশ। **বিছানো... বসানো**– মিলাদে, জিকির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। যিনি মিলাদ পড়াবেন কিংবা জিকির পরিচালনা করবেন তিনি বিশেষ জায়গায় বসেন। তাঁর দুপাশে কখনো কখনো মোমবাতি জ্বালানো হয়। সামনে থাকে চালভর্তি একটি পাত্র। তাতে গুঁজে দেয়া হয় অনেকগুলো ধুপকাঠি। ধুপকাঠিগুলো পুড়তে থাকে, তাতে একটি সুরভিত ধমীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। **বিস্ফারিত**– বড় হওয়া, ফুলে ওঠা। **বেচইন**– অস্থির, চিন্তাগ্রস্ত। **ভাতার**– স্বামী। **ভারিত**– ওজনদার, গভীর। **ভুরভুর–** ভরপুর, সবদিকে ভরে যাওয়া। **ভোতা উত্তেজনা**– তীব্র নয় এমন উত্তেজনা। **মরণাপন্ন**– মুমূর্ষ। **মড়ক**– মহামারি। **মাই**– বুকের দুধ। **মাজার পাক**– পবিত্র কবর। **মালুম**– ধারণা, অনুমান। **মিহিসুন্দর**– অতি সূক্ষ্ম, চমৎকার। **মেছোয়াক করে**– মাজে। **যোগশূন্য**– আলাদা, বিচ্ছিন্ন। **রগড়ে**– ডলে। **রুখতে–** বাধা দিতে। **রুহ–** আত্মা। **রোল**– আওয়াজ, শব্দ। **রুষ্ট**– রাগান্বিত। **রুষ্টতা**– রাগের ভাব। **লাকড়ি**– জ্বালানী কাঠ। **ল্যাট মেরে**– হাত পা ছড়িয়ে। **শিহরণ**– কাঁপন। **শীর্ণ**– রোগা, শুকনো। **সংযত**– নিয়ন্ত্রিত। **সত্তা–** অস্তিত্ব। **সন্নিকট–** কাছে। **সশঙ্কিত**– ভীত। **সহবাস**– একসঙ্গে বসবাস। **সিক্ত**– ভেজা। **সিধা**– সোজা।

স্ফুলিঙ্গ– আগুনের কণা। **হতবুদ্ধি**– বুদ্ধিহীন। **হদিশ**– ঠিকানা। **হনহনিয়ে**– তাড়াতাড়ি, দ্রুত গমন। **হল্কা**– তাপ। **হাশর**– ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। **হৈহুলস্থুল**– হট্টগোল, চীৎকার, ব্যস্ততা। **হুস**– জ্ঞান।

সারসংক্ষেপ

জ্যৈষ্ঠ মাসে মসজিদের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে সেরে ফেলে। নতুন বউ অল্পবয়সী, দেখতে অতি নিরীহ গোছের, নাম জমিলা। জমিলাকে খুব পছন্দ হয় রহীমার। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জমিলা বেরিয়ে আসে ঘোমটা থেকে, কথা বলে অনবরত এবং হাসতে থাকে। মজিদ বিচলিত হয়। মাজারে কেউ কখনো হাসে না। একদিন হেসে হেসে জমিলা রহীমাকে বুঝিয়ে দেয় যে মজিদ তার শ্বশুরের মতো, আর রহীমা তার শাশুড়ির মতো। একদিন এক খিটখিটে বুড়ি মজিদের কাছে বিপুল আর্তনাদ করে তার মৃত ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার চীৎকার জুড়ে দেয়। সেটি দেখে জমিলা কেমন পাথরের মতো হয়ে যায়। মজিদ এসব একেবারে পছন্দ করে না। মজিদের চিন্তা, হালকা কচি দেহ জমিলা এতখানি অবাধ্য কেন। মজিদ জমিলাকে আদর করে না। মধ্যরাতে ঢোলের আওয়াজে মজিদের ঘুম ভেঙে গেলে মজিদ দেখে জমিলা বিছানায় নেই। জমিলা তখন পাশের ঘরে রহীমার বুক লেপ্টে শুয়ে আছে। জমিলার ওপর মজিদের রাগ বেড়ে ওঠে। সে ঠিকভাবে নামাজও পড়তে পারে না। এতে মজিদ আরো ক্রুদ্ধ হয়। ঘুমন্ত জমিলাকে সে হ্যাঁচকা টান মেরে ওঠায়। জমিলার অবাধ্যতা সে কল্পনা করতে পারে না। জমিলা মজিদকে তোয়াক্কা করে না। জমিলা বুঝতে পারে সে খাঁচায় ধরা পড়েছে। একদিন বাদ মাগরিব মাজারে জিকির হয়। এ উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না হয়। মজিদ আজ বিশেষ সাজে সেজেছে। এক এক করে লোক আসতে থাকে। দোয়া দরুদ দিয়ে জিকির শুরু হয়, তারপর তা আস্তে আস্তে প্রচণ্ড গতি লাভ করে। জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকজন তার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে গাছের তলায় জমিলাকে ঘোমটাশূন্য অবস্থায় দেখা যায়। জ্ঞান ফিরে এলে মজিদও তাই দেখে। সে লোকজনের কাছে জমিলাকে কাজের বেটি রূপে পরিচয় দেয়। মজিদ রহীমার কাছে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে। জমিলাকে বিয়ে করার জন্য মজিদ অনুতপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. মজিদের মতে কাদের হাসি কেউ কখনো শুনে না?

ক. মুসলমানদের মেয়ে
খ. মাজারে আগত মেয়ে
গ. গারো পাহাড়ের মেয়ে
ঘ. আওয়ালপুরের মেয়ে

৩৪. 'আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না'– উক্তিটিতে মজিদ চরিত্রের কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে?

ক. অসহায়ত্ব
খ. ভীরুতা
গ. ধর্মবোধ
ঘ. অস্তিত্বসংকট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মকবুলের তিন বউয়ের মধ্যে সবার ছোট টুনি। সংসার কাকে বলে তা সে জানে না। সমবয়সী কারও সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু ভুলে গল্প জুড়ে দেয় আর হাসে। হাসতে হাসে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

৩৫. উদ্দীপকের টুনির সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. রহীমা
খ. জমিলা
গ. হাসুনির মা
ঘ. তানু বিবি

৩৬. উভয়ের সাদৃশ্যের যে কারণ–

i. বয়স
ii. মানসিকতা
iii. বাল্যবিবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- জমিলার ওপর ক্রুদ্ধ মজিদের নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মাজার ঘরে বন্দী দশায় রাত কাটানো জমিলার পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছো। খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছো। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার ওপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, –আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়ে বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিতো। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

–হুনছো নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে সে বলে,

–দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছো তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এ কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

–তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তাঁনার কাছে মাফ চাইবা। তাঁনার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিলো খেয়াল করেনি। মাজার ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এলো তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওযাজ থেমে গেলো। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করলো মাজার ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেলো ভয়ে। আবার বাইরে গেলো, আবার এলো ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এলো। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এলো তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করলো মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজারপাকের গল্পটা শুনে

চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

–তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তাঁনার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহীমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে, ওঘরে মজিদ হুকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহীমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহীমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহীমা, ঘুনধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে-থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে-ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। এক সময়ে রহীমা আস্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নাবে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীর-ধীরে মজিদ ওঠে। ও ঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে– এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে-পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারি যে, গলা ছেড়ে চীৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

–তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয় ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহীমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিলো, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদা-তায়ালার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহীমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিলো, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকালো। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখলো। তাতে হাত বুলালো না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেলো না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললো বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিলো, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিলো

জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিলো, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিলো, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারলো না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো।

পেছনে-পেছনে রহীমা আসছিলো কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলো না; এও বুঝলো না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহীমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বললো,

–হে আমার মুখে থুথু দিলো!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো রহীমা,

–কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহীমার চিৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বললো না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই। তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরো কঠিনতর করে তুললো। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো বাইরের দিকে। ভেবেছিলো, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এমন নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটু আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটু ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষীপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে

এসেছে এমনি সময়ে বুক ফাটা কণ্ঠে মজিদ হা-হা করে উঠলো। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিলো। সভয়ে চমকে ওঠে জমিলা, তাকালো স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণমান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠলো। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নাবা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু মজিদও ক্ষীপ্রভাবে উঠে দাঁড়ালো। জমিলা দেখলো পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এ সময় সে বলে,

–দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূতপ্রেতও রক্ষা পায় নাই। এ দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরিরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশোনির ভাব জাগলো না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?

এ বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধলো। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখলো, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

–তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এ সব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিলো, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলোও না, কিছু বললোও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বললো,

–ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তাঁনার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেলো।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

–হে কই?

–মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব সে-জিন।

–ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

–কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুথু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠলো মজিদের। দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বললে,

–তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহীমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইলো তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করলো না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইলো। যে-কোন মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ

আর্তনাদ শোনা যাবে– এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুললো। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে-থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীর্ঘগাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে-থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নাই।

আরো সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝির-ঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে-সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে রহীমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে-অপেক্ষা যুগযুগব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে-বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎচমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে অন্ধকারের তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়তো-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন কারণ, ভ্রুর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদ সঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎ বেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহীমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

–বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে।

রহীমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সে-দিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে– যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিলো।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটতো, এক আধটা হয়তো আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়তো, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসতো বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটতো বাইরে, লুফে-লুফে খেতো খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে– তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহীমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহীমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

–কী হইল তোমার? দেখ না শিলাবৃষ্টি পড়ে।

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহীমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহীমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

–কী হইলো তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

–ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটু ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমনকী তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহীমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

–মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এ রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

–না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহীমা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে ওঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্পমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

–দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতোমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে– সব তো গেলো। এবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

–নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবসর– সুযোগ, সময়। **অপরিণত**– যা পরিণত হয়নি। **অর্ধচক্রাকারে**– অর্ধ বৃত্তের মতো। **আত্মসচেনতায়**– নিজের উপলব্ধিতে। **আছর**– প্রভাব। **আর্তনাদ**– কাতর চিৎকার। **আদিগন্ত**– দিগন্ত পর্যন্ত। **আভা**– আলোর ছটা। **আরশ**– আল্লাহর আসন। **আড়মোড়া ভেঙে–** আলস্য ত্যাগ করে। **উচ্ছ্বাস–** ভাবাবেগ। **উদ্দামতা**– প্রবলতা। **উদ্ভাসিত**– আলোকিত। **উদ্‌ভ্রান্ত**– পাগলাটে, এলোমেলো। **উদ্বেগ**– চিন্তা। **উপভোগী**– যে ভোগ করে। **উপক্রম**– আয়োজন। **উল্কা**– হাউই। **উৎকণ্ঠিত**– চিন্তিত। **এৎবার**– প্রসন্নতা, দয়া। **কাটি-কাটি–** শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে এ রকম ভাব। **কাবু–** বশীভূত। **কুদরত**– মহিমা। **ক্ষীপ্রতায়**– দ্রুততায়। **ক্ষুদ্র পল্লব–** ছোট পাতা। **খোদাভাবমত্ত**– খোদার জন্য পাগল হয়েছে যে মানুষ। **গর্জন**– প্রবল চীৎকার। **গুমোট**– হাওয়া-বাতাসহীন অবস্থা, ভ্যাপসা গরম। **গোগ্রাসে**– বড় বড় গ্রাসে। **গোঁগোঁ–** গর্জনের শব্দ। **ঘনবর্ণ**– কালো রঙের। **ঘনীভূত**– বেশি ঘন হওয়া, বেড়ে খাওয়া। **ঘুনধরা হাড়–** বুড়ো হাড়। **ঘূর্ণমান**– যা ঘুরছে। **ঘোর**– আচ্ছন্নতা। **চকমকির পাথর**– এক ধরনের পাথর যা ঘষলে আগুন বের হয়। **চাবকাইতে (আঞ্চলিক শব্দ)**– চাবুক দিয়ে মারতে। **চিড়চিড়**– কোনো বস্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু কেটে যাওয়ার ভাব। **চিনচিনে**– অল্প অল্প। **জিন-পরী**– কল্পিত অশরীরী প্রাণী। **জিন**– মুসলমানদের মতে আগুনে তৈরি অশরীরী জীব। **ঝলসে ওঠা–** প্রখর আলোসহ প্রকাশ পাওয়া। **ঝলকানি**– হঠাৎ প্রখর আলোর চমক। **টনটন**– ব্যথা বেদনার অনুভূতির ভাব। **ঠাঁয়–** একই জায়গায়। **তাগিদ**– প্রেরণা। **তোয়াক্কল**– বিশ্বাস, নির্ভরতা। **তৃণখণ্ড–** খড়কুটো। **থরথর–** ভয়ে, ক্রোধে বা অন্য কারণে বেশি রকম কাঁপার। দুরন্ত অতিমাত্রায়। **থিয়েটার**– নাট্যশালা। **দম খিচে**– নিঃশ্বাস বন্ধ করে। **দরবার**– দরবেশ বা পীরের মাজার। **দাওয়া–** ঘরের মেঝের বাড়তি অংশ, বারান্দা। **দুর্বার–** যা বারণ করা কষ্টকর। **দুরন্ত**– প্রবল। **দুর্দান্ত–** প্রবল। **ধাঁ**– দ্রুত যাওয়া বা ওঠার ভাব। **নধর-কচি**– অতি কচি। **নাখোশ**– অসন্তুষ্ট। **নাজুক**– অপরিণত। **নাফরমানি**– অবাধ্যতা। **নিঃশব্দপ্রায়**– নীরব। **নিঃসৃত**– বের। **নিশ্চল**– স্থির। **নিষ্পেষিত–** পিষ্ট। **নিরলস দৃষ্টি–** সচেতন দৃষ্টি। **নির্বাক**– চুপ। **নির্মল**– পরিষ্কার। **পথ ভ্রষ্ট–** পথ হারিয়েছে যা। **প্রকৃতি অবলোকন**– প্রকৃতিকে দেখা। **প্রান্তে**– একদিকে। **পোষা জীবজন্তু**– গরু ছাগল ইত্যাদি। **ফলা–** তীরের তীক্ষ্ণ মুখ। **বজ্রমুষ্টি**– হাত দিয়ে ভীষণ শক্তভাবে ধরা। **ব্যাকুলতা**– আগ্রহ। **ব্যাপ্ত**– ছড়ানো। **বিদ্যুৎছটা**– বিদ্যুতের চমক। **বিনিদ্র**– ঘুমহীন। **বিমূঢ়–** হতবুদ্ধি। **বেঁকে বসলো**– অসম্মত হল। **মরণভীতি**– মৃত্যুর ভয়। **মায়াজাল–** ছলনা। **মেঘস্তূপ**–

মেঘের পুঞ্জ। **মুহূর্ত**– ক্ষণ, সামান্য সময়। **যবনিকা**– পর্দা। **যো**– উপায়। **রক্ত পানি হওয়া**– অতিরিক্ত ভয় পাওয়া। **রেখায়িত**– চিহ্নিত। **রুক্ষ**– কর্কশ, কঠিন। **লীলা**– গূঢ় কাজ। **লুফে লুফে**– ধরে নিয়ে। **শ্বসন**– নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। **শিষ**– ধান গাছের আগা। **সন্ধানী**– কৌতুহলী। **সর্বনাশা**– ধ্বংসকারী। **স্তব্ধতা**– নীরবতা। **স্বতঃপ্রবৃত্ত**– নিজেই উদ্যোগী। **সিক্ত**– ভেজা। **সুবেহ সাদেক**– সূর্য ওঠার আগে প্রভাতের রূপ, প্রথম ভোর। **সুহৃদ**– বন্ধু। **হুকায় দম দেয়**– হুকা টানে।

সারসংক্ষেপ

জমিলার শিক্ষা শুরু হয়। একবার বিনা অজুতে মাজারে গিয়ে তার কী হাল হয়েছিল এ-রকম একটা বানানো গল্পও সে জমিলাকে শোনায়। মজিদ জমিলাকে তারাবির নামাজ পড়তে ও পীরের কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। সে রাতে জমিলা জায়নামাজের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে মজিদ জমিলাকে হ্যাঁচকা টানে ঘুম থেকে তুলে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। উপায়ন্তর না দেখে জমিলা মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। মজিদ একেবারে থ মেরে যায়। তার মতো একজন শক্তিশালী মানুষের বিরুদ্ধে কেউ এমন প্রতিবাদ করতে পারে তা মজিদ কোনোদিন ভাবেনি। রহীমা আর্তনাদ করে। থুথু মুছে মজিদ জমিলাকে পাঁজাকোলা করে মাজারে নিয়ে আসে। এবার জমিলা আর প্রতিবাদ করে না। মজিদের কণ্ঠের হাহুতাশে জমিলা ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। সে একবার মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজিদ পথ বন্ধ করে রাখে। সে জমিলাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তাকে বলে এক রাত মাজারপাকের কাছে থাকলে দুষ্ট আত্মা বাপ বাপ করে পালাবে এবং এভাবে জমিলার মনে খোদাভীতি ও স্বামীভক্তি আসবে। জমিলাকে মাজার ঘরে আটকে রেখে মজিদ ঘরের ভেতরের দাওয়ায় বসে থাকে। আকাশে মেঘ জমে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, শীতল হাওয়া বয়ে যায়, ঝড় আসে তীব্র গতিতে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। ঝড়ের পরে নামে শিলাবৃষ্টি। শিলাবৃষ্টি থামলে মজিদ মাজারের ঝাপটা খোলে। জমিলা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে সালুতে ঢাকা কবরের পাশে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। দড়ি খুলে মজিদ তাকে ভেতরে নিয়ে আসে। রহীমা পরম আবেগে জমিলার গায়ে হাত বুলাতে থাকে। মজিদের মধ্যেও ভাবাবেগ জাগে। কিন্তু মজিদ নিজেকে সামলে নেয়। বলে, দুনিয়াটা একটা পরীক্ষা মাত্র। এরপর মজিদ মাঠের দিকে যায়। মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সে হাহাকাররত লোকজনদের নাফরমানি না করে খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. মজিদ জমিলাকে কোথায় বেঁধে রেখেছিল?

ক. মাজারে　　খ. মসজিদে
গ. কবরস্থানে　　ঘ. মক্তবে

৩৮. মজিদ কীভাবে সমাজে তার প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে?

ক. মানুষের অন্ধবিশ্বাসে　　খ. সমাজের সেবা করে
গ. অঢেল অর্থের জোরে　　ঘ. অলৌকিক ক্ষমতাবলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অমৃতা বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। সমাজের কঠোর নিয়ম-নীতি তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু বিয়ের পর তাকে এর মূল্য দিতে হয়েছে। অমৃতার হাসি, কান্না আর গানে বাধা আসে। এক সময় সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে।

৩৯. উদ্দীপকের অমৃতার সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. রহীমা　　খ. জমিলা
গ. আমেনা বিবি　　ঘ. তানু বিবি

৪০. উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের প্রতিবাদী চেতনা যে বিষয়ে–

i. কুসংস্কার　　ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি　　iii. অন্ধবিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৪১. বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস কোনটি?

ক. ঘরে-বাইরে
খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. দুর্গেশনন্দিনী
ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল

৪২. 'সালু' শব্দের অর্থ কী?

ক. কালো রঙের কাপড়
খ. লাল রঙের কাপড়
গ. মাজারের আবরণ
ঘ. কবরস্থানের আবরণ

৪৩. মোনাজাত শেষে মজিদ কোনদিকে পা ফেলেছিল?

ক. উত্তর
খ. দক্ষিণ
গ. পশ্চিম
ঘ. পূর্ব

৪৪. 'খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা'– উক্তিটি কার?

ক. ধলা মিঞার
খ. খালেক ব্যাপারির
গ. মজিদের
ঘ. তাহেরের

৪৫. জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে কোন ভাব জাগে?

ক. বড় বোন
খ. শাশুড়ি
গ. ননদ
ঘ. জা

৪৬. মজিদ মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের কী বলে গালি দেয়?

ক. নাস্তিক
খ. বেঈমান
গ. জাহেল
ঘ. কাফের

৪৭. 'লালসালু' উপন্যাসে কোন পীর সূর্যের গতি থামিয়ে রাখতে পারে?

ক. খালেক ব্যাপারির পীর
খ. গারো পাহাড়ের পীর
গ. আওয়ালপুরের পীর
ঘ. তাহেরের পীর

৪৮. মজিদের মুখে থুথু ফেলেছিল কে?

ক. হাসুনি
খ. রহীমা
গ. জমিলা
ঘ. আমেনা

৪৯. 'লালসালু' উপন্যাসের শেষ বাক্য কোনটি?

ক. নাফরমানি করিও না।
খ. বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।
গ. ধান দিয়া কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে?
ঘ. কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

৫০. 'লালসালু' কী ধরনের উপন্যাস?

ক. ধর্মীয় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন
খ. সামাজিক সমস্যামূলক
গ. রাজনৈতিক প্রচারধর্মী
ঘ. ইতিহাস আশ্রয়ী

৫১. 'তাই তারা ছোটে, ছোটে' –কেন?

ক. মাছ ধরার জন্য
খ. মাজার দেখতে
গ. জীবিকার সন্ধানে
ঘ. পীরের মুরিদ হতে

৫২. 'শস্যহীন জনবহুল' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

i. আকাল
ii. দুর্ভিক্ষ
iii. প্লাবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

৫৩. মজিদ মহব্বতনগরে কিসের জাল বিস্তার করেছে?

ক. ছলনা　　খ. মায়া

গ. অজ্ঞতা　　ঘ. বিশ্বাস

৫৪. 'খেলোয়াড় চলে গেছে এখন খেলবে কার সাথে?' – বাক্যটিতে 'খেলোয়াড়' কে?

ক. খালেক ব্যাপারি　　খ. ধলা মিঞা

গ. আওয়ালপুরের পীর　　ঘ. তাহেরের বাপ

৫৫. মানুষের নির্বোধ বোকামি আর অকৃতজ্ঞতার জন্য মজিদের মনে জেগে উঠে–

i. লোভ

ii. ঘৃণা

iii. ক্রোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

৫৬. মজিদকে থুথু দেয়ার মধ্য দিয়ে জমিলা চরিত্রে ফুটে উঠে–

i. বালিকাসুলভ আচরণ

ii. প্রতিবাদী চেতনা

iii. প্রথা অনুসারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

৫৭. 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে আবুলের মিল রয়েছে?

ক. মজিদ　　খ. তাহের

গ. আক্কাস　　ঘ. ঢেঙা বুড়ো

৫৮. এই মিল যে বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে–

i. ভালবাসায়　　ii. হিংস্রতায়　　iii. নারী নির্যাতনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বকুলপুরের পীর পর্দা রক্ষা করে চলেন। এজন্য মুরিদের বাড়ি গিয়ে তাকে নারীদের জন্য পর্দার আড়ালে ওয়াজ করতে হয়। একবার তিনি এভাবে ওয়াজ করতে গিয়ে রজবের সুন্দরী বউ করিমনকে বিয়ে করেন।

৫৯. উদ্দীপকের পীরের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসে যার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আওয়ালপুরের পীর　　খ. কাদেরের বাপ

গ. মজিদ　　ঘ. ধলা মিঞা

৬০. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে ফুটে উঠেছে–

i. ক্ষমতা　　ii. নারীলোলুপতা　　iii. গ্রাম্য রাজনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

এনায়েত বারী শহর থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে গ্রামে ফেরেন। ব্যথিত হন গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দেখে। তিনি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় পীরের মুরিদচক্র।

৬১. উদ্দীপকের এনায়েত বারীর চেতনা 'লালসালু' উপন্যাসে কার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. আক্কাস　　খ. তাহের

গ. কাদের　　ঘ. মতলুব খাঁ

৬২. উদ্দীপকের মুরিদ ও 'লালসালু' উপন্যাসের গ্রামবাসীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে–

i. গোঁড়ামি

ii. অজ্ঞতা

iii. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

রসময় চকোত্তি ভবা পাগলার মন্দিরে পুরোহিত। স্থানীয় মানুষের ধারণা তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ । মন্দিরে পূজা ও ভগবানের নাম সংকীর্তন করে তাঁর সময় কাটে। লোকে বলে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দশ গ্রামের মানুষ মন্দিরে আসে তাঁকে সেবা দিতে। শত মানুষের প্রার্থনা, আবদার, অনুযোগ আর দুঃখ, কষ্টে ভরে উঠে পাষাণ প্রতিমার মন্দির। প্রতিমার দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে জনতার কড়িতে ভরে ওঠে মন্দিরের কড়িকাঠ। কালের চক্রে রসময়ের ধন বাড়ে, মান বাড়ে আর প্রতিমার প্রতি আপামর জনতার বাড়ে ভয় আর ভরসা।

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. 'মজিদ ধরা- ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা।' –কেন?

গ. উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি 'লালসালু' উপন্যাসে কাকে ইঙ্গিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'লালাসালু' উপন্যাসে ধর্ম ব্যবসায়ের একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

এলাকায় শফি কবিরাজের বেশ নাম-ডাক। যে কোন অসুখ-বিসুখে গ্রামের লোকের তিনিই একমাত্র ভরসা। নিজের গরজে তিনি প্রায়ই স্থানীয় লোকজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। জনদরদী কবিরাজ বলে আশ-পাশের গ্রামের লোকজনও তাকে বেশ সমীহ করে। বিশেষ করে জ্বর, পেট ব্যথা, কলেরা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় তার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত। দেশিয় পদ্ধতিতে তিনি গাছের পাতা, ছাল, শেকড়-বাকড় থেকে ওষুধ তৈরি করেন। সম্প্রতি তার একচেটিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ফাটল ধরেছে। নদীর ওপারে যে নতুন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার এসেছেন আজকাল লোকজন ওখানেই ছুটছে। তাই সমাজে নিজের প্রভাব হারানোর ভয়ে শঙ্কিত শফি কবিরাজ। গোপনে তিনি কৌশল আঁটেন নতুন ডাক্তারকে তাড়াতে।

ক. মতলুব খাঁ কে?

খ. 'তোমার দাড়ি কই মিয়া' –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের শফি কবিরাজের মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের কার চেহারা ফুটে উঠেছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।" –স্বীকার করেন কি? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ :

বহিপীর : বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও

ঘটিল, বলিতে লজ্জা নাই, তাহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হইল যে, তাহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাহাকে টলাইতে পারি না। তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত।

ক. মজিদের ঘর কিসের তৈরি?

খ. 'যত সব শয়তানি বেদাতি কারবার' –কে, কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে?

গ. উদ্দীপকের বহিপীর 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়? –আলোচনা করুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে আংশিকভাবে হলেও নারীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।" –যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪ :

আলিমের বাড়ি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চরমোলাই ইউনিয়নে । সেখানে শিক্ষার আলো যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছেছে এমন কথা বলা যাবে না। যদিও স্থানীয়ভাবে কিছু বেসরকারি সংস্থা সেখানে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছে। কিন্তু মৌলবাদিদের প্রভাবে সে প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এবারে আলিম এবং তার বন্ধু কয়েকজন যুবক মিলে সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। স্কুলের জন্য তারা জায়গাও নির্বাচন করে ফেলে। কিন্তু তাদের এ উদ্যোগের কথা জেনে স্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয় স্থানীয় মসজিদের ইমাম বজরা শাহি ও তার অনুগত কয়েকজন মুসুল্লি। তাদের ভাষ্য হচ্ছে,"নির্ধারিত স্থানে মসজিদ না হলে মাদ্রাসা হবে, কিন্তু কোনোক্রমেই স্কুল নয়।"

ক. 'বতোর' কিসের উৎসব?

খ. 'নিরাক পড়া শ্রাবণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটিতে 'লালসালু' উপন্যাসের যে আবহ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা অনেক সময় মানবিক সমাজ গড়ায় অন্তরায় হয়।" –উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫ :

মসজিদে কাল শিরনী আছিল,-অঢেল গোস্ত রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে,"বাবা আমি ভূখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন।"
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা-'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?
ভুখারি কহিল,'না বাবা !' মোল্লা হাঁকিল-'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত- রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।

ক. খালেক ব্যাপারির শ্যালকের নাম কী?

খ. "অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই।" –কেন?

গ. উদ্দীপকে 'লালসালু' উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চরিত্রগত দিক থেকে উভয়ের অভিন্নতা রয়েছে।" –যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

খ.

'মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা।'– উক্তিটি দিয়ে মহব্বতনগর গ্রামে রহীমার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ পুরুষ চরিত্র। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে সহজেই মহিলাদের সঙ্গে মিশতে পারেনা। প্রকৃতিগতভাবে নারীদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। কিন্তু মহব্বতনগর গ্রামের নারীদের মজিদের সঙ্গে কথা বলার সরাসরি কোন পথ নেই, মজিদের কাছে তারা সরাসরি পৌঁছাতে পারেনা। তাদের একটি উপায় অবলম্বন করতে হয়, আর সে উপায়টি হচ্ছে রহীমা। মজিদ আর মহব্বতনগর গ্রামের নারীদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে দেয় রহীমা। অবশ্য মহব্বতনগর গ্রামে রহীমার কদরও কম নয়। মজিদের স্ত্রী হিসাবে সে গ্রামে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান পায়।

গ.

উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি 'লালসালু' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদকে ইঙ্গিত করে।

আবহমানকালের বাংলার মানুষ সহজ ও সরল জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত। প্রকৃতিগতভাবে তারা ধর্মভীরু এবং পীর-পুরোহিতদের প্রতি তাদের অন্ধ ভক্তি রয়েছে। মানুষের এই ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে এক শ্রেণির ধূর্ত লোক নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠে তাদের।

উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি ভবা পাগলার মন্দিরের পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন ব্রাহ্মণ। তাই সে নিজেকে খুব সহজেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। আশপাশের দশ গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, আবদার-প্রার্থনা, অভিযোগ-অনুযোগে তার মন্দির সব সময় সরগরম থাকে। সাধারণ মানুষের কষ্টে ভারি হয় পাষাণ দেবতার মন্দির। আর তাদের অর্থ সম্প্রদানে ভরে উঠে মন্দিরের গোলা। এতে রসময় চকোত্তির ধন বাড়ে, মর্যাদা বাড়ে আর জনমনে বাড়ে ভয় ও ভরসা। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসে দেখা যায় অজ্ঞাত পরিচয় এক মোদাচ্ছের পীরের কবরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় মজিদের মাজার ব্যবসায়। ঝালরওয়ালা সালু কাপড় দ্বারা আবৃত মাছের পিঠের মতো সে কবর। মজিদের প্রচারণায় এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে মানুষজন আসতে থাকে মাজারে। তাদের কান্না, হতাশা, আশার কথা, সবকিছুই সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মত অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে আছড়ে পড়ে দিনের পর দিন। অর্থ-কড়ি, রোগ-চিকিৎসায় বিভিন্ন দৈব-দুর্বিপাকে মুশকিল আসান করে সাধারণ মানুষের অর্থে মজিদের গোলা ভরে উঠে। এভাবে মহব্বতনগর গ্রামে সে হয়ে উঠে বিশেষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রকে ইঙ্গিত করে।

ঘ.

উদ্দীপকে মন্দির ও পুরোহিতের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়, একই চিত্র দেখা যায় 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ ও তার মাজারকেন্দ্রিক ধর্ম ব্যবসায়ে। অর্থাৎ মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

ধর্ম সাধারণ মানুষের নিকট ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের আশ্রয়। এটি মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। আবার এই ধর্মকে পুঁজি করে অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে। কখনোবা ধর্মকে অবলম্বন করে সমাজের উপরের উঁচুস্তরে উঠতে চায়। ধার্মিকতা যদি অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মব্যবসায়ীদের চেতনার উপর নির্ভর করে তবে তা অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ।

উদ্দীপকে রসময় চকোত্তির শক্তির কেন্দ্র ভবা পাগলার মন্দির। অভিজাত ব্রাহ্মণ রসময় পাষাণ দেবতাকে জাগ্রত করেছে কূটকৌশলে। সে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে আপন স্বার্থের গান গেয়েছে। দেবতাকে তুষ্ট করতে গ্রামের মানুষের শ্রমের ফসলে ভরে তুলেছে মিথ্যার মন্দির। এতে পুরোহিতের ধন বেড়েছে, মান বেড়েছে, আর মানুষের বেড়েছে ভয় ও ভরসা। পক্ষান্তরে 'লারসালু' উপন্যাসেও দেখা যায় কুসংস্কার ও অজ্ঞতার সুযোগ-সন্ধানী ধূর্ত চরিত্রের উপস্থিতি। মজিদ এ ধরণের চরিত্রের প্রতিভূ। সমাজের মানুষের সরলতার সুযোগ নেয় সে। খরা, ভয় ও ভরসার নাটক সাজিয়ে এরা ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। মূলত শোষণ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা মানুষের দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে। পরকালের আজাবের ভয় দেখানোও এদের অন্যতম কৌশল। উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি এবং 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ একই শ্রেণির প্রতিনিধি। তারা উভয়েই ধর্মব্যবসায়ী। ধর্মের অসার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তারা মানুষকে নিপীড়ন করে ও ধোঁকা দেয়। মানুষকে ধর্মীয় আবেগে সম্মোহিত করে ও আত্মিক ক্ষমতার মায়াজালে আটকে রেখে তারা ধনে, মানে ও জানে বড় হয়ে উঠে। 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ ও উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি চরিত্র তাই ভণ্ডামি ও ধোঁকাবাজির উজ্জ্বল উদাহরণ। অতএব, সার্বিক আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে ধর্ম ব্যবসায়ের একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক.

মতলুব খাঁ স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

খ.

'তোমার দাড়ি কই মিয়া?' –মহব্বতনগর গ্রামের মোদাচ্ছের পীরের মাজারের খাদেম মজিদ উক্তিটি করেছে ।

আক্কাস শিক্ষিত ছেলে। সে শহর থেকে পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরেছে। তার একটি স্বপ্ন রয়েছে নিজ গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার। কেননা গ্রামের মানুষ লেখাপড়া শিখলে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, সভ্যতার অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ী মজিদ নিজের স্বার্থহানির আশঙ্কায় এ প্রস্তাবে বৈরিতা সৃষ্টি করে। ধর্মের ফাঁদ পেতে সে আক্কাসকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচার মজলিশে মজিদ আক্কাসকে কৌশলে ধর্মীয় অনুভূতির উক্ত কথাটি দ্বারা ঘায়েল করে। এতে আক্কাস বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এমনকি সে তার পিতার বকুনি খায়। মজিদের তীব্র আক্রমণের মুখে তার মুখে কোন কথা যোগায় না।

গ.

উদ্দীপকের শফি কবিরাজের মধ্যে মজিদের চেহারা ফুটে উঠেছে।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে চায়। সে ভীত হয়ে পড়ে কখনো অস্তিত্ব সংকটে পতিত হলে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সে যে কোন কাজ করে ফেলতে পারে। অস্তিত্ব সংকটে পড়া একজন মানুষ ভণ্ড, স্বার্থপর, শঠ ও প্রতারক হতে পারে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ এক রহস্যময় চরিত্র। মহব্বতনগরে বানোয়াট কাহিনি তৈরি করে সে নিজের ভাগ্যকে গড়ে নেয়। সাধারণ মানুষ তার নিকট থেকে ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে একটু ধারণা পায়। শিরালির জন্য নাচানাচি করা যে ধর্মসম্মত নয়, একথা সে জানত তবুও ব্যক্তিস্বার্থে সে এর বিরোধিতা করেনি। মজিদ কায়েমি স্বার্থবাদী মানুষ হলেও সকলে তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করত। এভাবে সমাজে তার একটু প্রভাবও তৈরি হয়। কিন্তু কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বা জানাশোনা লোকের সামনে পড়লে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাকে তাড়ানোর কৌশল খুঁজে বেড়ায়। উদ্দীপকে শফি কবিরাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সে অল্প শিক্ষিত কবিরাজ, চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেনা। তবুও গ্রামের লোকজন তার নিকট ভরসা পায়। দেশিয় পদ্ধতিতে তার কলেরা, বসন্ত রোগের চিকিৎসা বেশ ভালই। কিন্তু নদীর ওপারে এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার এলে সে ভয়ে গুটিয়ে যায়। তখন তাকে তাড়ানোর জন্য শফি কবিরাজ ওঠে-পড়ে লাগে। আর এখানেই শফি কবিরাজের মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের চেহারা ফুটে উঠে।

ঘ.

'উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।' -মন্তব্যটি স্বীকার্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন অস্তিত্ববাদী কথাশিল্পী। অস্তিত্বের সংকট এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্যকে সে সংকটে ফেলে দেয়ার যে ধারাবাহিক জৈব প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে কাজ করে তা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মধ্যে ফুটে উঠেছে অস্তিত্বের সংকট। আর উদ্দীপকের শফি কবিরাজের জানা নেই চিকিৎসাবিদ্যা, এমবিবিএস পাস করা ডাক্তার দেখলে কিংবা নাম শুনলেই সে আতঙ্কে পাংশুটে হয়ে যায়।

উদ্দীপকের শফি কবিরাজ একজন হাতুড়ে ডাক্তার। চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা নেই। তবুও সে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার পরামর্শ ও চিকিৎসায় মানুষ যে উপকার পায়নি এমন নয়। কিন্তু ধারেকাছে পাস করা ডাক্তার কিংবা নামকরা কবিরাজ এলে নিজের আসন হারানোর ভয়ে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে 'লালসালু' উপন্যাসেও মজিদ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খুব সামান্যই জ্ঞান রাখে। ইসলামের মহত্ত্ব ও আদর্শ তার মধ্যে একপ্রকার নেই বললেই চলে। কিন্তু অপকৌশলে সে মহব্বতনগরের অজ্ঞ সমাজে নিজের আধিপত্য বজায় রাখে। তার আশেপাশে যখন কোন জ্ঞানী আলেমের আগমন ঘটে তখন সবকিছু হারানোর ভয়ে সে কাঁপতে থাকে। আওয়ালপুরের পীর যখন ধর্মীয় সফরে মজিদের পাশের গ্রামে আসেন তখন এ চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। পীর সাহেব এলে হয়তো মজিদের ফাঁকি ধরা পড়ে সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। তাই নিজের অস্তিত্বের তাড়নায় সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ এবং উদ্দীপকে শফি কবিরাজ দুজনেই ধূর্ত এবং সমাজের দৃষ্টিতে চতুর। মজিদ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও ধর্ম নিয়েই তার ব্যবসা। অন্যদিকে শফি কবিরাজ চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে অল্প ধারণা নিয়েও পশার জমিয়েছে। তারা উভয়েই প্রভাবশালী। কিন্তু নিজেদের ফাঁকি ধরা পড়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়েছে। তাই প্রকৃত জ্ঞানী লোক কেউ এলে মজিদ ও শফি কবিরাজ দুজনেই তাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ উপন্যাস ও উদ্দীপক দুইয়েরই চরিত্রগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ এর নমুনা উত্তর :

ক.

মজিদের ঘরটি ইটের তৈরি।

খ.

আওয়ালপুরের পীরের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তার কাজকে ভণ্ডামি আখ্যা দিয়ে মজিদ উক্তিটি করেছে।

মহব্বতনগরের পাশের গ্রাম আওয়ালপুর। সে গ্রামে হঠাৎ একজন পীরের আগমন ঘটে। অন্য অনেকের মত মজিদও কৌতুহলবশত সে গ্রামে পীরকে দেখতে যায়। সেখানে সে নবাগত পীরের জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে মজিদ খুব একটা পাত্তা পায় না। এমনকি যারা তাকে চিনে ও ভক্তি করে তারাও সেদিন তাকে খুব একটা সমীহ করেনি। আওয়ালপুরে মজিদ পীরের নানা কেরামতির কথা শুনতে পায়। একবার সে দেখতে পায় পীর সাহেব অসময়ে নামাজ পড়তে হুকুম দিয়েছেন। আর সে এ সুযোগটিই কাজে লাগায়। অবশেষে মজিদ পীরের কেরামতির অসারতা প্রমাণের জন্য আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ.

উদ্দীপকের বৃদ্ধ চরিত্রের মানসিকতা 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত রয়েছে। অনেক সময় এখানে নারীদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এদেশের নারীদেরকে সেবাদাস হিসাবে মনে করে। তাদের চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

উদ্দীপকের বহিপীর মজিদ চরিত্রেরই প্রতিরূপ। বহিপীর বৃদ্ধ বয়সে একজন নারীকে বিয়ে করে। কিন্তু এই বিয়েতে সে নারীর মত ছিলনা। তাই দেখা যায় বিয়ের পরে নারী চরিত্রটি স্বামী বহিপীরের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বহিপীরও জেদ ধরেছে যেভাবেই হোক সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু বহিপীরের স্ত্রী শেষ পর্যন্ত অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে, আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছে। বস্তুত বহিপীরের চরিত্রে নারীর প্রতি হীনমন্যতা এবং নারীকে ভোগ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। এমনটি দেখা যায় 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদ চরিত্রে। মজিদ ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে অল্পবয়সী নারী জমিলাকে বিয়ে করে। তার এই আচরণে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও স্বার্থপরতার দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়টি অবান্তর ছিল।

ঘ.

'উদ্দীপক এবং 'লালসালু' উপন্যাসে আংশিকভাবে হলেও নারীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।' –উদ্দীপকের নারী চরিত্র এবং উপন্যাসের জমিলার ক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

আবহমানকাল থেকে বাংলার সমাজ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক। আর এদেশের পরিবারগুলো পুরুষ প্রধান। এখানে নারীরা কেবল ঘরের বউ। তারা ঘরের কাজ করে আর বাচ্চা-কাচ্চা সামলায়। এ সমাজের পরিবার প্রথায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণত নারীদের অংশগ্রহণ থাকে না। তবুও এর মধ্যেই কোনো কোনো নারী ভিন্নভাবে চিন্তা করে, প্রতিবাদী হয়ে উঠে। সে তার স্বাধীন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

উদ্দীপকের নারী চরিত্রটি পিতা-মাতার অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের শিকার। তাকে বিয়ে দেয়া হয় নারীলোলুপ এক বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে। এখানে তার মতের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। কিন্তু নারী চরিত্রটি তার নিয়তিকে মেনে নেয়নি। সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। বহিপীরের দৃঢ়চেতা দৃষ্টিভঙ্গির সামনেও সে নত হয়নি। নিজের অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বহিপীর তাকে টলাতে পারেনি। অন্যদিকে 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদও বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করে অল্প বয়সী নারী জমিলাকে। জমিলাকে বিয়ে করার পর থেকে মজিদ খুব কম সময়ই স্বস্তিতে থাকতে পেরেছে। জমিলা চপলা, চঞ্চলা আর ধর্মে তার

অন্ধবিশ্বাস নেই। সে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার কৌতুহলের কারণে জিকির দেখার জন্য উঠানে নেমে আসে। বস্তুত জমিলার স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে মজিদের শাসন আলগা হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের নারী চরিত্র আর 'লালসালু' উপন্যাসের জমিলা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্যের শিকার। কিন্তু তারা কেউই প্রচলিত সমাজকে নির্বিরোধ মেনে নেয়নি। জমিলা মাজারের গায়ে পা তুলে দিয়ে বিদ্রোহ করেছে। আর নারী চরিত্রটিকে বহিপীর কোনো অবস্থাতেই টলাতে পারেনি। তারা বৈষম্যমূলক সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রতিবাদী হয়েছে। নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে। জমিলা এবং উদ্দীপকের নারী চরিত্রটি সমাজকে বদলে ফেলতে পারেনি, কিন্তু এর শেকড়কে মুচড়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও 'লালসালু' উপন্যাসে আংশিকভাবে হলেও নারীর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬ :

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীর সাহেবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন রহিম সর্দার। তাই করেন হুজুর তাই করেন। এক বাক্যে সায় দিল চাষিরা। গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজিকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজির। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

ক. কোন মাসে মজিদ দ্বিতীয় বউ ঘরে তোলে?

খ. "খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।" –কথাটি বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের মনোয়ার হাজির সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? তুলে ধরুন।

ঘ. "লালসালু' উপন্যাসে ফুটে ওঠা সমাজচিত্র উদ্দীপককেও স্পর্শ করেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭ :

মৌলবী সাহেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন; "... দীনের চেরাগ আলেম-ফাযেলরা দুনিয়ার চিন্তা হতে ফারেগ হতে না পারিলে তাহারা এছলামের রওনক বৃদ্ধি করিবেন কেমন করিয়া? মুসলমানদের যে আজ তঙ্গদস্তি দূর হচ্ছে না, তার কারণ ইহারা আলেম সমাজের হক আদায় করিতেছে না। আলেম সমাজকে যদি পেটের চিন্তা করিতে হয়, তবে আর ইসলামের চেরাগ জ্বালাইয়া রাখিবে কাহারা? এই জন্য হাদিস শরিফে আসিয়াছে নায়েবে রসুলদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজের।"... মৌলভী সাহেবকে অর্থ সাহায্য করিয়া এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিলেন।

ক. আমেনা বিবির সতীনের নাম কী?

খ. "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।" –বাক্যটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের মৌলবির সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের ভিন্নতা তুলে ধরুন।

ঘ. "উদ্দীপক এবং 'লালসালু' উপন্যাসে আলোকিত জীবন নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে অবলম্বন করা হয়েছে।" –মন্তব্যটি বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

০১. গ	০২. খ	০৩. খ	০৪. ক	০৫. ক	০৬. খ	০৭. গ	০৮. খ	০৯. ক	১০. গ	১১. ক	১২. ঘ
১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. গ	১৭. খ	১৮. ক	১৯. ক	২০. ঘ	২১. খ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ঘ
২৫. ক	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ঘ	৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ঘ
৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. ঘ	৪১. খ	৪২. খ	৪৩. ক	৪৪. গ	৪৫. খ	৪৬. গ	৪৭. গ	৪৮. গ
৪৯. খ	৫০. খ	৫১. গ	৫২. ক	৫৩. ক	৫৪. ঘ	৫৫. ঘ	৫৬. খ	৫৭. ঘ	৫৮. গ	৫৯. গ	৬০. গ
৬১. ক	৬২. ঘ										